জননায়ক জওহরলাল

মণি বাগচি

"যদি কেউ কোনোদিন আমার সম্পর্কে একান্তই ভাবতে চায়, তা'হোলে সে যেন এই কথা ভাবে যে, এই লোকটি ভারত ও তার জনগণকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল আর তারাও তাঁকে দিয়েছিল তাদের সীমাহীন ভালবাসা।"—নেহরু

JANANAYAK JAWAHARLAL

A Bengali biography of

Jawaharlal Nehru

By : Moni Bagchee

জননায়ক জওহরলাল

মণি বাগচি

সুতপা প্রকাশনী
কলিকাতা-২৩

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সতীর্থবরেষু
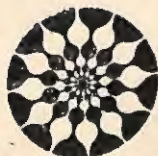
মণি বাগচির

॥ পরবর্তী বই ॥

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র

বিদুষী মার্কিন লেখিকা পার্ল বাক নেহরুর মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন, "এই বিশ্বের মানবজীবনের প্রত্যেক শতাব্দীতে খুব কম লোকই থাকেন যাঁরা আমাদের সকলের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এইরকম একজন লোক ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁকে ভুলতে পারা যায় না।"

সত্যিই নেহরুকে ভুলতে পারা যায় না।

জওহরলাল নেহরু।

নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা একটি নাম।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেও এই নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জওহরলালের আত্মচরিত ও ফ্রাঙ্ক মোরেসের লেখা নেহরুর ইংরেজি জীবনচরিত—প্রধানত এই বই দু'খানি অবলম্বনে 'জননায়ক জওহরলাল' মোটা তুলিতে আঁকা তাঁরই একটি জীবনালেখ্য। এর বেশি এই বইখানি সম্বন্ধে বলার নেই।

১০ বাগুইআটি রোড,
দমদম, কলিকাতা-২৮
১৯৬৪

মণি বাগচি

"সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নিজের জীবন দিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে এমন মানুষের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়। জওহরলাল নেহরু সেই মুষ্টিমেয় মানুষের একজন। তাঁহাদের বাণী দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং তাঁহার আদর্শ ভবিষ্যৎ কালের মানুষের পথকে আলোকিত করে।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ জওহরলাল নেহরুর স্মৃতির প্রতি গভীর দুঃখ ও ভাবাবেগের সহিত শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। তাঁহার ও জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর প্রীতির বন্ধন ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ। জীবনকালে তিনি যে আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়াছিলেন তাহার আলোক কোন দিন ম্লান হইবে না। তিনি যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের জন্য তিনি যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন তাহার জন্যই আমাদেরও নূতন করিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে।"

—রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন

১
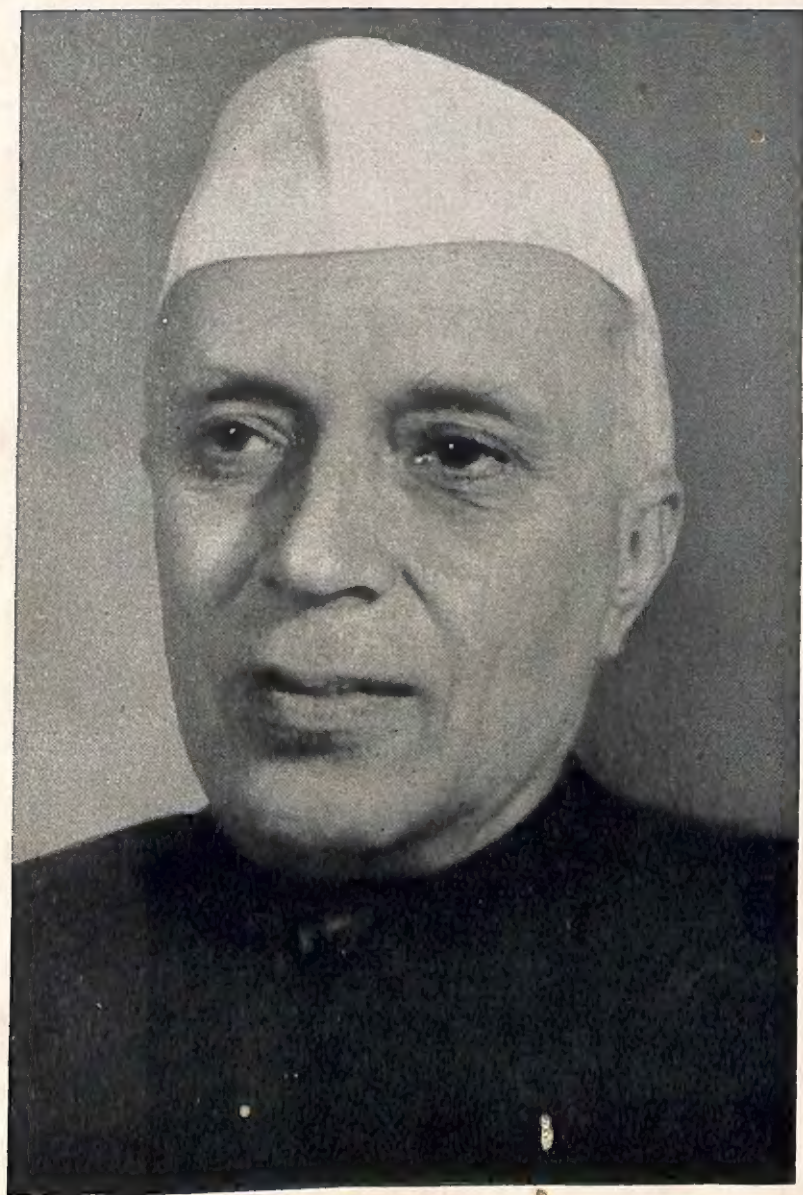
১৯২৯, ডিসেম্বর।

সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে লাহোরের ওপর।

রাবি নদীর তীরে সারি সারি কংগ্রেস-শিবির।

প্রত্যেকটি শিবিরের শীর্ষভাগে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা।

পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব হয়ে উঠেছে প্রাণ-চঞ্চল।

এ বছর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন।

স্মরণীয় সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জওহরলাল নেহরু। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর।

৩১শে ডিসেম্বর। পুরাতন বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সেই স্মরণীয় অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলাল কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে উত্থাপন করলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। কংগ্রেসের চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসে জাতির সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে রাবি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক সৈনিক জওহরলালের কণ্ঠে উচ্চারিত হোল—"পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।" ত্রিশ হাজার জনতার সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে করতে তিনি উচ্চারণ করলেন: "পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।"

নৈশবায়ু তরঙ্গে সেই বাণী ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের কোটি নর-নারীর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলল এক নতুন স্পন্দন।

রাবি নদীর বুকে তরঙ্গ তুলল সেই বাণী—তার প্রতিধ্বনি উঠল পঞ্চনদের কূলে কূলে। নতুন বছরে পরাধীন ভারতবাসী গ্রহণ করল নতুন শপথ—“পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।” স্বাধীনতার শপথ পাঠ করলেন জওহরলাল। ত্রিশ হাজার কণ্ঠে উঠল তার প্রতিধ্বনি —“ব্রিটিশ শাসন ও শোষণমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার শপথ আমরা গ্রহণ করলাম। জীবন দিয়ে এই শপথ আমরা সার্থক করব।” তখন কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে, এর কুড়ি বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ ইংরেজ-শাসনমুক্ত হোয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে?

১৯৪৭, ১৪ই আগস্ট। রাত্রি বারটা।

নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি। বেজে উঠল জয়ঢাক। পরশাসনমুক্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে আজ পদক্ষেপ করল। শহরে শহরে আলোকসজ্জা; পথে ও ময়দানে হাজার হাজার লোকের জনতা। জনতার মুখে-চোখে উল্লাস আর আনন্দ। চারিদিকে শুধু রং আর আলো। গ্রামেও ছড়িয়ে গেছে সেই উল্লাস আর সেই আলো।

সেদিন সেই রাত্রে দিল্লী নগরী ছিল উৎসবময়ী।

কাতারে কাতারে লোক চলেছে পার্লামেণ্ট ভবনের দিকে।

মহাসভা ভবনের অভ্যন্তরে জাতির নেতারা সমবেত হয়েছেন রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের শেষ অঙ্ক দেখবার জন্য। তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন জওহরলাল। আজ তাঁর বয়স আটান্ন বছর। আটান্ন বছর, তবু তাঁকে তেমনি দৃপ্ত ও সতেজ মনে হচ্ছে যেমন ছিলেন তিনি সেই ১৯২৯ সনের ডিসেম্বরে। সেদিন জাতির তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতার বাণী। আজো জাতির মুক্তির প্রতীক হিসেবে এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে সকলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই।

রাত্রির মধ্য প্রহর ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জাতির নেতা জওহরলালের কণ্ঠে উচ্চারিত হোল ঐতিহাসিক ঘোষণা। ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন: "আঠারো বছর আগে আমরা এক পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছিলাম। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার শপথ। আজ আমরা সেই শপথ সার্থক করলাম। মধ্যরাত্রির এই নিস্তব্ধ প্রহরে সারা পৃথিবী যখন সুপ্ত, তখন ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে এক নতুন জীবন স্পন্দনে—জেগে উঠেছে সে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার গৌরবে। একটা যুগের আজ অবসান হোল। আরম্ভ হোল আর একটা নতুন যুগ। দীর্ঘকাল পরপদানত জাতির আত্মা আজ হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়। আজ আমরা স্বাধীন।"

ঘোষণার শেষে তিনি বললেন: "আমরা যাঁদের প্রতিনিধি সেই অগণিত ভারতবাসীকে আমরা এই আবেদন জানাই যে, তাঁরা যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের এই নতুন অভিযানে আমাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়ান। আমরা গড়ে তুলব স্বাধীন ভারতের নতুন সৌধ, যেখানে প্রত্যেকটি ভারতীয় সন্তান সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ আমরা এই নতুন শপথ গ্রহণ করলাম।"

নভেম্বর ১৪, ১৮৮৯।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

ঐ দিন এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন জওহরলাল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন চার বছর হোল স্থাপিত হয়েছে। তখন কে ভেবেছিল যে, এলাহাবাদে নেহরু-পরিবারে যে শিশুটির জন্ম হোল, তিনিই ভবিষ্যতে একদিন এই কংগ্রেসের সেবক, সৈনিক ও নেতারূপে তাঁর দেশবাসীর চিত্ত জয় করবেন।

বড়োঘরের একমাত্র পুত্র জওহরলাল।

পিতা—স্বনামধন্য মতিলাল নেহরু।

শক্তি, সাহস ও প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্যে তাঁর তুলনা ছিল না। প্রথম সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন মতিলালের বয়স আটাশ বছর। নেহরু-পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। তাই বুঝি সৌন্দর্যপ্রিয় জওহরলাল চিরকাল এই রমণীয় উপত্যকার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করতেন। "সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন, ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আমার মানসপটে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে আছে।" এই কথা কতবার বলতেন জওহরলাল। কাশ্মীরের রূপময়ী প্রকৃতি যেন নিজের হাতে স্পর্শ করেছিলেন শিশু জওহরলালকে সূতিকাগারে। রূপে ও রূপের লাবণ্যে এই জননায়কের দেহ-শ্রী ছিল যেমন সুঠাম তেমনি আকর্ষণীয়। মা স্বরূপরাণী ছিলেন সৌন্দর্যের প্রতিমা। পিতা মতিলালও ছিলেন সুপুরুষ। পিতামাতার দৈহিক সৌন্দর্য আর মানসিক প্রকৃতি নিয়েই এই পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলেছিলেন জওহরলাল।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হোলেও আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে মতিলাল ছিলেন একেবারে সাহেবী ভাবাপন্ন। তাঁর পেশা ছিল ওকালতি। কর্মজীবনে তিনি যখন ধীরে ধীরে খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন তখন স্বরূপরাণীর কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করলেন জওহরলাল।

নেহরুর বয়স যখন তিন বছর তখন মতিলাল এলাহাবাদের সাহেবপাড়ায় একটি প্রকাণ্ড বাংলো ভাড়া নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। জওহরলালের শৈশবের দিনগুলি ছিল নিঃসঙ্গ। বাড়িতে ছেলেমেয়ে ছিল অনেক। বংশীধর ও নন্দলাল নামে মতিলালের দুই অগ্রজ ছিলেন। এঁদেরই সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ ছিল নেহরু-পরিবার। বয়সে তারা সবাই ছিল জওহরলালের চেয়ে অনেক

বড়ো। সেই বিরাট পরিবারের মধ্যে শিশু নেহরু তাই নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতেন।

মতিলাল ঠিক করেছিলেন ছেলেকে তিনি পাশ্চাত্য প্রথায় গড়ে তুলবেন। ফার্ডিনাণ্ড টি ব্রুকস নামে একজন আইরিশ গৃহ-শিক্ষকের কাছে জওহরলালের শৈশবের শিক্ষা শুরু হয়। উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর শৈশবের সোনার দিনগুলি। কবিতা পড়া আর লেখা—এই ছিল তাঁর বালক বয়সের অন্যতম নেশা। এলাহাবাদে তিনি কোনো স্কুলে পড়েন নি। ছেলের জন্য মতিলাল মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য যেমন, তেমনি ভাল ভাল গৃহ-শিক্ষকের জন্য তিনি প্রচুর টাকা খরচ করতেন। ইংরেজ গভর্ণেস আর ইংরেজ গৃহ-শিক্ষক—ছেলেবেলায় তিনি এঁদের তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। একজন দেশীয় পণ্ডিতও নিযুক্ত হয়েছিলেন বালক জওহরলালকে হিন্দী আর সংস্কৃত শেখাবার জন্য। তবে সমস্ত গৃহ-শিক্ষকের মধ্যে একমাত্র ব্রুকস-ই তাঁর শৈশবজীবনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন।

জওহরলাল নিজেই বলেছেন: "আমার শৈশবকালের অন্যতম গৃহ-শিক্ষক মিস্টার ব্রুকসের কাছ থেকেই আমি বিশেষভাবে দুটি জিনিস শিক্ষালাভ করেছিলাম—বই পড়ার আগ্রহ আর বিজ্ঞানে কৌতূহল। তাঁর কাছে আমি পড়েছিলাম তিন বছর এবং এই সময়ে তাঁর সযত্ন শিক্ষার গুণে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার মনে গভীর অনুরাগের সঞ্চার হয়। ইংরেজী কাব্যের প্রতিও আমার অনুরাগ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।"

ইংরেজী ভাষাতেই তাঁর শৈশবের শিক্ষা আরম্ভ হয়। বোধহয় এই কারণেই আজীবন তিনি এই ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। আহমেদনগর দুর্গে যখন তিনি শেষবারের মতো বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন, তখন এইখানে তাঁর সঙ্গে একই কারাকক্ষে বাস করতেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আজাদ বলেছেন: "নেহরু ঘুমিয়ে

ঘুমিয়েও ইংরেজীতে কথা বলতেন। তিনি যে শুধু ইংরেজীতে কথা বলেন তা নয়, তিনি ইংরেজীতে স্বপ্নও দেখেন।"

জওহরলালের বয়স যখন দশ বছর তখন মতিলাল 'আনন্দ ভবন' নামে প্রাসাদোপম একটি বাড়ি কিনলেন এবং সপরিবারে সেইখানে উঠে আসেন। তখন তাঁর মাসিক আয় বিশ হাজার টাকা। ধনী ও বিলাসী বলে তখন তাঁর খ্যাতি লোকের মুখে মুখে। মতিলালের 'আনন্দ ভবন' একটা বিরাট বাড়ি—বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড বাগান। বাগানে কত রকম ফল ও ফুলের গাছ। মাঝখানে একটা পুকুর। বাড়ির এই পুকুরেই জওহরলাল সাঁতার কাটা শিখেছিলেন। এই প্রাসাদে নানাবিধ বিলাসিতা আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ধনীর দুলাল জওহরলালের জীবনের অনেকগুলি দিন অতিবাহিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মতিলাল কংগ্রেসকে এই বাড়ি দান করে যান এবং তখন এর নাম হয় 'স্বরাজ ভবন'। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তর অনেককাল এই স্বরাজ ভবনে অবস্থিত ছিল। এই স্বরাজ ভবনেই শুরু হয়েছিল জওহরলালের রাজনৈতিক জীবন।

মতিলালের আনন্দ ভবনে এলাহাবাদের গণ্যমান্য বহু ইংরেজ রাজপুরুষদের সমাগম হোত। ছেলেবেলায় জওহরলাল এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে সেই সময় থেকেই তাঁর মনে ইংরেজ-প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেনঃ "মনে-প্রাণে আমি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করতাম।" এই ইংরেজ-প্রীতি তিনি আজীবন পোষণ করেছিলেন।

খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন মতিলাল। পুত্র জওহরলাল তাই পিতার সান্নিধ্য থেকে দূরে-দূরে থাকতেন। তাঁকে তিনি রীতিমত ভয় করতেন। কখনো কখনো মতিলাল ছেলেকে নিয়ে খেলা করতেন—ক্রিকেট ও টেনিস খেলা শেখাতেন। কখনো পিতাপুত্র দুজনে মিলে ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দবোধ করতেন। সন্ধ্যাবেলায় মতিলাল যখন তাঁর

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং মদ্যপান করতেন, বালক জওহরলাল পর্দার অন্তরাল থেকে তা দেখতেন। দৈবাৎ যদি মতিলাল দেখে ফেলতেন অমনি তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে হাঁটুর ওপর বসাতেন। জওহরলাল বলেছেন যে, তখন তিনি রীতিমত ভয় পেতেন। পিতার সেই হাস্য-পরিহাসপূর্ণ সান্ধ্যবৈঠকের স্মৃতি পুত্র জওহরলাল জীবনে বিস্মৃত হননি।

ছেলেবেলায় বাবার চণ্ডমূর্তি একবার দেখেছিলেন জওহরলাল। এমনিতে মতিলাল ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু যখন কোনো কারণে তিনি রেগে যেতেন তখন তাঁর সেই ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। জওহরলালের বয়স তখন ছ'বছর। যে ঘরটায় বসে তাঁর বাবা লেখাপড়া করতেন, হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেই ঘরটার মধ্যে এসে পড়েছেন। তিনি দেখলেন, টেবিলের ওপর দুটো ফাউণ্টেন পেন রয়েছে। বালকের মনে চিন্তা জাগল, একটা মানুষের পক্ষে একসঙ্গে দুটো কলমের প্রয়োজন হোতে পারে না। একটা কলম তিনি তুলে নিলেন। যখন মতিলাল জানতে পারলেন যে তাঁর টেবিল থেকে একটি কলম অদৃশ্য হয়েছে, তখন তিনি তাঁর রাগ সামলাতে পারলেন না—চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। "আর একটা কলম কোথায় গেল?"—পিতার এই ক্রুদ্ধ আওয়াজ শুনে জওহরলাল রীতিমত শঙ্কিত হোলেন। বলতে পারলেন না যে, তিনি নিয়েছেন। কিন্তু হারানো কলমটা যখন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল তখন মতিলাল পুত্রকে বেদম প্রহার করলেন। "পিতার অমন রুদ্রমূর্তি কখনো দেখিনি। তাঁর বলিষ্ঠ হাতের প্রহারে আমি রীতিমত বেদনা বোধ করলাম এবং মায়ের কাছে ছুটে পালিয়ে গেলাম। তারপর অনেক দিন ধরে আমার পিঠে বেদনার স্থানে মালিশ ও মলম লাগাতে হয়েছিল।"—এই কথা জওহরলাল নিজেই বলেছেন।

ছেলেবেলায় তিনি তাঁর মা ও কাকিমার কাছ থেকে (নন্দলালের

বিধবা স্ত্রী) ভারতীয় পুরাণ ও রূপকথার গল্প শুনতেন। মায়ের কাছ থেকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনেছিলেন। মুন্সী মুবারক আলি বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান তাঁদের বাড়িতে এই সময়ে বাস করত। মুন্সী ছিল মতিলালের প্রধান খানসামা। তার কাছ থেকেই বালক জওহরলাল আরব্যরজনীর গল্প শুনেছিলেন আর শুনেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর কাহিনী। "মুবারক বলতো যে, সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কতকগুলো ইংরেজ সৈন্য তার বাবাকে ধরে তার মায়ের চোখের সামনেই ফাঁসী দিয়েছিল। তার মাথার চুল আর দাড়ি ছিল সব শাদা, মুখখানি রেখা-বহুল। আমার কাছে সে ছিল একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতীকস্বরূপ। শৈশবের বহু প্রিয় স্মৃতির মধ্যে এই মুবারকের স্মৃতিও আমার কাছে মূল্যবান।"

নিজের পিতার প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখেছেন, "আমার বাবা ঠিক ধার্মিক মানুষ ছিলেন না, তবে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কারণ আমার পিতার শৈশব ঐ রকম পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল।" ধর্মজীবনে মতিলাল প্রথমে ছিলেন থিওসফিস্ট। ভারতবর্ষে য়্যানি বেশান্তের তখন খুব নাম—তিনিই ছিলেন এদেশে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রী। ছেলেবেলায় জওহরলাল এলাহাবাদে য়্যানি বেশান্তের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই বালকের মনে এই ইচ্ছা জাগে যে বড়ো হয়ে তিনিও একদিন য়্যানি বেশান্তের মত বক্তৃতা দেবেন। জওহরলালের উপনয়নে য়্যানি বেশান্ত আচার্যের কাজ করেছিলেন। তিনিও ছেলেবেলায় কিছুদিনের জন্য য়্যানি বেশান্তের ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—উত্তরকালে অবশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই এর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন।

জওহরলালের ছেলেবেলার (তখন তার বয়স চৌদ্দ-পনর হবে) আর একটি ঘটনা রুশ-জাপান যুদ্ধ। এই ঘটনা ১৯০৪-১৯০৫ সনের। উত্তরকালে কন্যা ইন্দিরাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

"এই শতাব্দীর গোড়ায় একটা ঘটনা ঘটেছিল যার প্রভাব সমগ্র এশিয়ার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। এ হোল জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়। জারের আমলের রাশিয়া, কত তার সৈন্যবল! জাপান তার তুলনায় কত ক্ষুদ্র! ভেবে ছাখো, সেই জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দিলে। আমার আজো বেশ মনে পড়ে যখন যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের সংবাদ এলো তখন আমি কী উত্তেজনা-ই না বোধ করেছিলাম।"

জওহরলালের বয়স যখন এগার বছর তখন তাঁর ছোট বোন বিজয়লক্ষ্মীর জন্ম হয়। সঙ্গীহীন বাড়িতে একটি ছোট বোনের আবির্ভাবে জওহরলালের মন স্বভাবতই আনন্দে ভরে উঠেছিল। বিজয়লক্ষ্মীর জন্মকালে মতিলাল এলাহাবাদে ছিলেন না, তিনি তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তারপর ১৯০৫ সনে জওহরলাল তাঁর পিতামাতা ও চারবছরের বোন বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। পথে ডোভার ও লণ্ডনের মধ্যে ট্রেনে বসে খবরের কাগজ খুলে যখন তিনি জাপানের সেনানায়ক টোগোর জয়লাভের সংবাদ পাঠ করলেন, তখন তাঁর সমস্ত হৃদয় এশিয়াবাসীর শৌর্যের গৌরবে ভরে উঠেছিল।

২

হ্যারো স্কুল।

লণ্ডন থেকে প্রায় দশমাইল দূরে অবস্থিত এই বিখ্যাত স্কুলটি রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থাপিত হয়েছিল। বড়ো বড়ো ঘরের ছেলেরাই এখানে পড়ত। সাধারণত হ্যারোতে ছেলেরা ভর্তি হয় তেরো বছর বয়সে; জওহরলাল যখন ভর্তি হোলেন তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। আরো পাঁচজন ভারতীয় ছাত্র তখন এখানে পড়তেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বরোদার গায়কোবাড়ের ছেলে; তিনি বয়সে জওহরলালের চেয়ে কিছু বড়ো ছিলেন। আর ছিলেন কর্পূরতলার মহারাজকুমার। এঁর সঙ্গে জওহরলালের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

১৯০৫ সনের বড়দিনে জওহরলাল হ্যারো স্কুলে ভর্তি হোলেন। ১৯০৭-এর গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে পাঠ করেন। তিনি একটু বেশি বয়সেই এখানে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেছিলেন, কারণ হ্যারোতে এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য শিক্ষায়তনে ভর্তি হওয়ার বয়স হোল তেরো বছর। ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে মতিলাল ফিরে এলেন। প্রথম প্রথম জওহরলাল বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করতেন এবং বাড়ির জন্য তাঁর মন কেমন করত। হ্যারো একটি আবাসিক স্কুল এবং প্রধান শিক্ষক মিস্টার যোসেফ উডের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানেই তিনি ছিলেন। তাঁর মতোন জনপ্রিয় শিক্ষক সে সময়ে হ্যারোতে খুব কম ছিলেন। তিনি রীতিমত বিদ্বান ছিলেন ও সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি খুব কড়া শাসনের মানুষ ছিলেন না। ছাত্রদের সবসময়ে বেতের ডগায় রাখতে

হবে, এই ধারণায় তাঁর খুব আস্থা ছিল না। এই স্কুলে ইংলণ্ডের অনেক বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পীল, পামারস্টোন, বলডুইন ও উইনস্টন চার্চিলের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার এই স্কুলেরই আর একজন ছাত্র যে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করবেন—এই কথা কি তখন মতিলাল নেহরু ভাবতে পেরেছিলেন ?

ক্রমে ক্রমে নতুন পরিবেশে মন বসল ভারত থেকে নবাগত ছাত্রটির। তবে জওহরলাল নিজেই বলেছেন, "আমি হ্যারো স্কুলে নিজেকে কখনো পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারিনি।" ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা ছাত্রদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। জওহরলাল ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলা ভালবাসতেন ; এখানে তাই এ বিষয়ে তাঁকে কোনো অসুবিধাই ভোগ করতে হয়নি। Harrow School Corps-এ তিনি যোগদান করেছিলেন। যে শিক্ষকের অধীনে এই ছাত্র-বাহিনী ছিল, তিনি ছাত্র জওহরলাল সম্পর্কে বলেছেন যে, "একজন প্রকৃত সৈনিক হওয়ার সকল সম্ভাবনাই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।" কথাটি এক হিসাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। উত্তরকালে গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক সৈনিক। সে কথা পরে বলব।

একবার হ্যারো স্কুলের ছাত্রেরা বন্দুক ছোড়ার প্রতিযোগিতায় একখানা শীল্ড লাভ করল। বিজয়ীদল একটি ঘোড়ার গাড়ি করে ফিরছিল। পথে গাড়ির ঘোড়াগুলি খুলে নেওয়া হোল ; ছেলেরাই উৎসাহভরে গাড়ি টানতে লাগল। জওহরলালও তাদের সঙ্গে মিলে গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। নেহরু এই স্কুল ছেড়ে যাওয়ার অনেককাল বাদে এখানকার একজন শিক্ষক তাঁর স্মৃতিকথায় নেহরু-সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "তখন হ্যারোর প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিস্টার উড। নেহরু তাঁরই বাড়িতে বাস করতেন। বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে।

তার রুচিও খুব মার্জিত ছিল। সে একটু লাজুক প্রকৃতির ছিল, নিজেকে বড়ো একটা জাহির করার চেষ্টা করত না। তবে তার সঙ্গে একটু কথা বললেই বোঝা যেত যে তার চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। ছাত্র হিসেবে সে শিক্ষকদের প্রিয় ছিল।"

হ্যারোতে পড়বার সময়ে জওহরলাল এক চিঠিতে তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন ঃ "বাবা, আমি এখন এখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি। মিস্টার উড আর মিস্টার স্টজডন দুজনেই আমার পড়াশুনা সম্পর্কে খুব যত্ন নিয়ে থাকেন। এঁরা দুজনেই বেশ অমায়িক প্রকৃতির এবং উন্নত চরিত্রের মানুষ। তবে আমার সহপাঠীদের বড়ো নীরস মনে হয়। আমি স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক বই পড়ি। খবরের কাগজ তো নিয়মমতই পড়ি। এখানকার খুব কম ছাত্রই সংবাদপত্রপাঠে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। ফলে, এদের অনেকের চেয়ে আমি সাধারণ জ্ঞানে অনেক বেশি এগিয়ে আছি। সেদিন ক্লাসে একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, বলো দেখি ইংলণ্ডে নতুন যে উদারনৈতিক সরকার গঠিত হয়েছে, তার সদস্যদের নাম কি কি? সব ছাত্রই দেখি পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করছে। খবরটা আমার জানা ছিল, আগের দিন কাগজেই পড়েছিলাম। তাই আমি দাঁড়িয়ে উঠে সভ্যদের নাম এক-এক করে বলে দিলাম। শিক্ষক মহাশয় আমার খুব প্রশংসা করলেন আর আমার সহপাঠীরা সবিস্ময় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।"

বিজ্ঞান পাঠে তাঁর গৃহ-শিক্ষক ব্রুকস যে আগ্রহ জওহরলালের মনের মধ্যে জন্মিয়ে দিয়েছিলেন তা তাঁর সমানভাবেই রয়ে গিয়েছিল। তখন সবেমাত্র আকাশপথে বিমানচালনা দেখা দিয়েছে। ১৯০৫ সনে উইলবুর ও অরভিল রাইট নামে দুই ভাই যখন পঁয়তাল্লিশবার আকাশপথে বিচরণ করেন এবং একবার আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাড়ে

চব্বিশ মাইল পথ শূন্যে অতিক্রম করেন তখন সংবাদপত্রে সেই বিবরণ পাঠ করে জওহরলাল যারপরনাই কৌতূহল বোধ করেছিলেন। এই সময়ে হ্যারো থেকে এক চিঠিতে তিনি বাবাকে লিখেছিলেন যে, হয়ত এক সপ্তাহের জন্য তিনি এরোপ্লেনে চড়ে এলাহাবাদে এসে বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবেন।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল।

জওহরলালের মন এখন এখানকার পরিবেশের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে। হ্যারোর মনোরম পরিবেশের মধ্যে মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নে ডুবে থাকেন তিনি। কবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবেন, এই চিন্তা তাঁকে এই সময়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে থাকে। তিনি যখন হ্যারো স্কুলের ছাত্র সেই সময়ে ট্রেভেলিয়ানের লেখা তিনখণ্ডে সমাপ্ত গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত পাঠ করে মুগ্ধ হন। ইতালির স্বাধীনতার জন্য গ্যারিবল্ডির সংগ্রামের কাহিনী পাঠ করে কিশোর জওহরলালের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তিনি পরাধীন দেশের মানুষ, গ্যারিবল্ডির মতো তিনি কি একদিন তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন না? এই ধরণের চিন্তা ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। গ্যারিবল্ডির এই জীবনচরিতখানি তিনি স্কুলে পারিতোষিক হিসাবে লাভ করেছিলেন। জওহরলাল নিজেই বলেছেন: "গ্যারিবল্ডির এই জীবনচরিতখানি আমার চিরজীবনের সঙ্গী ছিল।"

ছাত্রজীবনেই রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

স্বদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তিনি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন। বিলেতের কাগজগুলোতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সব খবর বেরুতো তিনি সেগুলি যত্নের সঙ্গেই পাঠ করতেন। এই সময়ে লর্ড মিন্টো নতুন বড়োলাট হয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন।

লর্ড মোর্লে তখন ভারত-সচিব। এঁরা দুজনে মিলে ভারতবাসীর জন্য একদফা শাসন-সংস্কার পার্লামেণ্টে সুপারিশ করেছেন। ইংলণ্ডের মহাসভা সেই সুপারিশ গ্রহণ করে সেইমত নতুন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করেছেন। নামে মাত্র সংস্কার, তার মধ্যে শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকারই দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের নির্দেশে ভারতবাসী সেই সংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা দেশ যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলন সারা দেশে এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব জাগরণ। বিলিতি জিনিস বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য দেশবাসীর মনে জেগেছে আগ্রহ। "বিলেতের খবরের কাগজগুলি থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই সব সংবাদ যতটুকু পাঠ করতাম তাতেই আমার মনে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হোত; কিন্তু হ্যারোতে এমন একজন মানুষ তখন আমি পাইনি যার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। তাই মনের উত্তেজনা মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হোত।" এই কথা লিখেছেন জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে। তবে ছুটীর সময়ে তিনি মাঝে মাঝে ভারতীয় ছাত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

লর্ড কার্জন যখন একটি আদেশ জারি করে এক বাংলাকে ভেঙে দু' টুকরো করেন তখন থেকেই ভারতবাসীর মনে দেখা দিতে থাকে এক অপূর্ব জাগরণ। বাঙালী এক মন এক প্রাণ হয়ে সেই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এবং সেই প্রতিবাদেরই পরিণতি ইতিহাস-বিখ্যাত 'স্বদেশী আন্দোলন'। বিলেতে বসে এই আন্দোলনের সংবাদ পাঠ করে তরুণ জওহরলালের মনে স্বাধীনতালাভের যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল তাই তাঁকে পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতিতে পরিণত

করেছিল। ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তখন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক ছিলেন বাল গঙ্গাধর টিলক। উগ্র জাতীয়তাবাদী এই মারাঠি ব্রাহ্মণের জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও সংগ্রাম জওহরলালকে সেই বয়সেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পঞ্জাব, বাংলা ও মারাঠা—এই তিনটি প্রদেশের লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও বালগঙ্গাধর টিলক (এই তিনজন জাতীয়তাবাদী দেশনেতাকে সংক্ষেপে বলা হোত—লাল-বাল-পাল)—এই তিনজন চরমপন্থী নেতাদের বক্তৃতা পাঠ করে হ্যারোতে অধ্যয়নরত ছাত্র জওহরলালের মন আশায় ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত।

এই সময় আর একজন দেশপ্রেমিকের প্রতি আকৃষ্ট হন তরুণ জওহরলাল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষ। বারো বছর ইংলণ্ডে পড়েছিলেন ইনি এবং কেমব্রিজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে তিনি বরোদার গাইকোবাড়ের কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর যখন বাংলা দেশ থেকে আহ্বান এলো, তিনি রাজ-সরকারের উচ্চ বেতনের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশের মুক্তিসাধনের পবিত্র ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখনকার দিনে তাঁর মতো ইংরেজী-জানা মানুষ এদেশে খুব কম ছিলেন। এই অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ভারতের রাজনীতিতে এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল।

হ্যারোতে বসে জওহরলাল একদিন খবর পেলেন পঞ্জাবের লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নির্বাসিত করেছেন। খবর পেলেন ভারতরক্ষা আইনে বাংলা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত নেতাও নির্বাসিত হয়েছেন। টিলককেও নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। দেশে জাগরণ দেখা দিয়েছে, বিপ্লব দেখা দিয়েছে।

ইংরেজের অধীনতা বন্ধন থেকে ভারতবাসী মুক্তিলাভ করতে চায় এবং এর জন্য কোনো ত্যাগকেই তারা আজ সামান্য মনে করে না। কোনো নির্যাতন বা রাজদণ্ডকেই তারা ভয় করে না। ভারতের আত্মা যে এক দুর্বার প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলমোচনের সংকল্প গ্রহণ করেছে, প্রবাসে এই সংবাদ ছাত্র জওহরলালকে রীতিমত চঞ্চল করে তুলেছিল।

১৯০৭।

জওহরলাল ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হোলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই কলেজটি ইংলণ্ডের একটি সেরা কলেজ। তখন তাঁর বয়স আঠারো। সুন্দর সুঠাম চেহারা। গৌরবর্ণ, মাথার চুল ঘোর কালো রঙের, চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাতুর। বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী কথা বলেন। সহজেই তিনি ট্রিনিটি কলেজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কেমব্রিজ তখন বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও দর্শনের পঠন-পাঠনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি নেহরুর ছিল স্বাভাবিক আগ্রহ। তাই কেমব্রিজে তিনি Natural Science Tripos—এই পাঠক্রম নির্বাচন করলেন। তখন তাঁকে পড়তে হোত রসায়ন, ভূ-তত্ত্ববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা।

জওহরলালের জ্ঞানস্পৃহা কিন্তু পাঠ্যসূচীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। ইহা ছিল দূর দিগন্তে প্রসারিত। রাজনীতি আর অর্থনীতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। তেমনি আকর্ষণ করেছিল ইতিহাস আর সাহিত্য। সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। কেমব্রিজে ভর্তি হয়ে তাঁর পড়াশুনা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। যে তিন বছর তিনি কেমব্রিজে পড়েছিলেন সেই তিন বছর ইংলণ্ডের

মানসলোকে দেখা দেয় এক প্রবল চেতনা। নতুন উন্মাদনা। সে উন্মাদনা ছিল জ্ঞানের, ছিল বুদ্ধির। বিলীয়মান গোধূলি থেকে য়ুরোপ যতই একটি বিশ্বযুদ্ধের পানে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই তার চিত্তলোক মনীষার নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। বার্গসঁ, এইচ. জি. ওয়েলস, জর্জ বার্ণার্ড শ, টমাস হার্ডি, প্যাবলো পিকাসো, ফ্রয়েড প্রভৃতির বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা এবং সকলের ওপর আইনস্টাইনের বিস্ময়কর আবিষ্কার—এরই ফলে য়ুরোপের মানসলোকে দেখা দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত।

ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নকালে এই নবোদ্ভাসিত দিগন্তের প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে তরুণ জওহরলালের মানসলোকও ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে যে দুজন লেখকের রচনা তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল তাঁরা হোলেন ডিকিনসন ও মেরিডিথ টাউনসেণ্ড। টাউনসেণ্ডের *Asia and Europe* বইখানি বিশেষভাবে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধাঁচ অনেকটা সেইভাবেই গড়ে উঠেছিল।

ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজী কবিতাপাঠে জওহরলালের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সুইনবার্ণ, অডেন, এলিয়ট, মেসফিল্ড, ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার, স্পেণ্ডার আর ইয়েটস—বিশেষভাবে এই কয়জন কবির কবিতা পাঠ করে জওহরলালের সাহিত্য-পিপাসা চরিতার্থ হয়। আনন্দভবনের পারিবারিক গ্রন্থাগারে এঁদের কাব্যগ্রন্থ-গুলি আজো সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি যখন কেমব্রিজের ছাত্র তখন ১৯০৯ সনের বসন্তকালে সুইনবার্ণের মৃত্যু হয়। সুইনবার্ণের একটি কবিতার এই কয়টি লাইন জওহরলালের খুব প্রিয় ছিল :

These many years since we began to be
What have the gods done with us? What with me?
What with my love? They have shown me fates and fears.
Harsh springs, and fountains bitterer than sea,
Grief a fixed star, and joy a vane that veers
These many years.

তিনি যখন কেমব্রিজের ছাত্র তখন এখানে পড়তেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (জে. এম. সেনগুপ্ত) যিনি পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সেনগুপ্ত নেহরুর চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন এবং জওহরলাল যখন এখানে প্রবিষ্ট হন, সেনগুপ্ত তখন এখানকার অধ্যয়ন শেষ করেছেন। অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন বিহারের সৈয়দ মামুদ (ইনি স্বাধীন ভারতে নেহরু-মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন), উত্তরপ্রদেশের তাসাদ্বুক আহমদ খান শেরওয়ানি ও সফীউদ্দীন কিচলু। আর একজন সহপাঠী ছিলেন শ্রীপ্রকাশ। শ্রীপ্রকাশ পরবর্তীকালে নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একজন সহকর্মীও ছিলেন।

তাঁদের প্রবাস-জীবনের একটি ঘটনা শ্রীপ্রকাশ এইভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার তাঁরা দুজনে লণ্ডনে তাঁদের উভয়ের পরিচিত এক ভারতীয় বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। শ্রীপ্রকাশ লিখেছেন: "আমি একটু আগে থেকেই গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে নেহরু এলেন। তিনি আগাগোড়া সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই আগুনের কাছটায় বসলেন এবং অনর্গল নানা বিষয়ে

আলোচনা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খেতে দাও। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামীর স্ত্রী দুজনেই পরম যত্নের সঙ্গে আমাদের দুজনকেই আহার করালেন। তখন অনেক রাত। অত রাতে লণ্ডনে বাসই বা কোথায় আর টিউবই (ভূগর্ভস্থ রেলপথ) বা কোথায়? কাছাকাছি কোথাও ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই। আমরা দুজনে বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরুলাম। আমি কাছেই থাকতাম, কিন্তু নেহরুর বাসা ছিল বেশ খানিকটা দূরে।"

"তুমি এত রাতে কেমন করে বাড়ি ফিরবে।" প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার জন্যে ভেবো না," নেহরু তখনি জবাব দিলেন। "আমি একাই যেতে পারব।" এই বলে রাত্রির অন্ধকারে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রকাশ বলেন, ঠিক এই রকম উত্তরই তিনি আজো দিয়ে থাকেন—"তাঁর এই নির্ভীক প্রকৃতির এখনো এতটুকু পরিবর্তন হতে দেখিনি।"

সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খানের ভাই, ডাক্তার খান সাহেব তখন লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালের ছাত্র ছিলেন। ইনিও নেহরুর প্রথম জীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নেহরু নিজেই বলেছেন: "আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন এমন একটি দিনও ছিল না যখন খান সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়েছে।"

সত্যিই, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে জওহরলাল প্রাণ খুলে মেলা-মেশা করতেন এবং বন্ধুদের সঙ্গ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। তাঁর প্রকৃতি যদিও এমনিতে কিছুটা গাম্ভীর্য-মণ্ডিত ছিল, কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে তিনি যেন স্বতন্ত্র মানুষ। তাঁর বন্ধুরাও তাই সব সময়ে নেহরুর বন্ধুত্ব কামনা করতেন। বন্ধু হিসেবে নেহরু অদ্বিতীয়, এই কথা লিখেছেন শ্রীপ্রকাশ।

কেমব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি সমিতি ছিল। এর নাম 'মজলিশ'। তখন কেমব্রিজে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। তাঁরা সকলেই মজলিশের সভ্য ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে যখন কোনো বিতর্ক থাকত তখন মজলিশের অধিবেশন হোত। নেহরু এই মজলিশে প্রায়ই আসতেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে এখানে প্রায়ই আলোচনা হোত। কিন্তু জওহরলাল ঐ আলোচনায় খুব বেশি যোগদান করতেন না। তাঁর স্বাভাবিক লাজুক প্রকৃতির জন্যই হোক অথবা গাম্ভীর্যবশতই হোক, লণ্ডনে ছাত্রজীবনে প্রকাশ্যে তিনি খুব কম বক্তৃতা করেছেন। মজলিশের একটা নিয়ম এই ছিল যে একজন সভ্য যদি পুরো একটা term-এর মধ্যে কোনো বক্তৃতা না করেন, তবে তাঁকে জরিমানা দিতে হোত। নেহরু অনেকবারই জরিমানা দিয়েছিলেন।

কেমব্রিজে সেই সময় অনেক ভারতীয় পরিদর্শক আসতেন। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মে খ্যাতিলাভ করেছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিও ছিলেন। বাংলাদেশের নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন এই পরিদর্শকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি তখন লণ্ডনের সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্লাডস্টোন যেমন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সামনে কথা বলার সময়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতেন, বিপিন পালও তেমনি যদি কোনো জনসভায় একটি মাত্র শ্রোতা উপস্থিত থাকত দেখতেন, তা' হোলেই যথেষ্ট। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সেই একজন শ্রোতার কাছেই প্রকাশিত হোত। ভারতীয় ছাত্রদের গোটা বারো সভায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। জওহরলাল বলেছেন: "মিস্টার পালের বক্তৃতা সামান্য জিনিস ছিল না—তা ছিল যেন নায়েগ্রার জল-প্রপাতের মতো। লণ্ডনে আমার ছাত্রজীবনে তাঁর বক্তৃতা শুনে অবধি আমি তাঁর প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেমন তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনি

উচ্চারিত বাক্যের দ্রুত তাল। অনেক সময়ই আমি তাঁর বক্তৃতা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারতাম না।"

তবে তিনি পঞ্জাবের জননায়ক লালা লাজপৎ রায়ের বক্তৃতা শুনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের বক্তৃতাও তাঁর ভালো লাগত। জাতীয় আন্দোলনের এইসব বিশিষ্ট জননায়কদের তাঁর ছাত্রজীবনে দেখে অবধি জওহরলালের মনে সেই বয়সেই একটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছিল। সে আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশসেবার মহৎ ইচ্ছা। "আমিও একদিন আমার স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করব"—ছাত্র জওহরলাল কত সময় মনে মনে এইরকম চিন্তা করতেন।

১৯১০।

জওহরলাল এখন কুড়ি বছরের যুবক।

কেমব্রিজে পড়া শেষ হোল।

ন্যাচুরাল সায়ান্স ট্রাইপোজে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করলেন। স্কুল ও কলেজে তিনি যে খুব প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তা নয়। বরং এ কথা বলা চলে যে ছাত্র হিসাবে তিনি মাঝামাঝি ধরণের ছিলেন এবং বিশেষ কৃতিত্ব কখনো দেখাতে সক্ষম হন নি।

বালক বয়সে রুশ-জাপানের যুদ্ধের ফলে যে জাতীয়তাবোধ জওহরলালের মধ্যে উন্মেষিত হয়েছিল, কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে সেই জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে তীব্র এবং প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেমব্রিজের পড়া যখন শেষ হোল, তখন পিতার অনুমতি নিয়ে জওহরলাল কিছুদিন সিবিল সার্ভিসের জন্য পড়তে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁর মতের পরিবর্তন হয় এবং পৈতৃক পেশার অনুসরণ করবেন
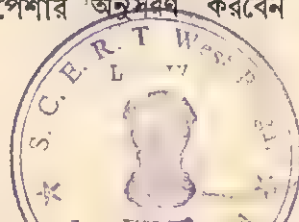
ঠিক করেন। তিনি আইনজীবী হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন। সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে চাকরি তিনি পেতেন বটে, কিন্তু তাতে এলাহাবাদে থাকা চলত না। তাই মতিলাল পুত্রকে পরে আইন পড়ার জন্য লিখে পাঠান এবং তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে বলেন।

কেমব্রিজ থেকে এবার তিনি এলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনে কাটলো আর দুটি বছর।

এখন তিনি আইনের ছাত্র। ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হোতে লাগলেন। তাঁর এই সময়কার লণ্ডন-জীবনে তিনি যে মনীষী ব্যক্তির প্রতিভা ও চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তিনি হোলেন স্বনামধন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল। পৃথিবীর যে কয়জন জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠদের প্রতি তিনি তাঁর হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হোলেন এই বার্ট্রাণ্ড রাসেল। ১৯৬২ সনে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে, তখনো এই বিষয়ে লর্ড রাসেলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের পত্র বিনিময় হয়েছিল।

১৯১২।

জওহরলাল ঐ বছরের গ্রীষ্মকালে ব্যারিস্টারি পাস করলেন। প্রায় আট বছরকাল তিনি প্রবাসে কাটিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মাত্র দু'বার বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি যখন কেমব্রিজের ছাত্র তখন তাঁর আর একটি বোনের জন্ম হয়। ইনি কৃষ্ণা—শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতিসিং। কৃষ্ণার জন্ম হয় ১৯০৭ সনের নভেম্বর মাসে। কৃষ্ণার আগে স্বরূপরাণীর আর একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু হয়।

এইভাবে হ্যারো, কেমব্রিজ ও লণ্ডনে পড়াশুনা করে নেহরু যখন

কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরলেন তখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছর। এই দীর্ঘকাল য়ুরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে থাকার ফলে তিনি আচারে-আচরণে অনেকটা সাহেবী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। কোথাও যেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতাম না, কোথাও যেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না"—নেহরু নিজেই এই কথা লিখেছিলেন অনেককাল পরে। স্বদেশে তিনি ফিরলেন বটে, ফিরলেন যেন একজন নির্বাসিতের মনোভাব নিয়ে। নিজের দেশের পরিচয় তখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে একরকম অজানা-ই ছিল। তাই বুঝি পরিণত বয়সে তিনি একখানি বই লিখলেন এবং তার নাম দিলেন, 'ভারত আবিষ্কার।"

৩

নেহরু দেশে ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে।

বিলেত থেকে ফিরে কয়েক মাস বেশ আনন্দে কাটল। বাড়িতে ফিরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পুরোনো দিনের পরিচয় নতুন করে তিনি ঝালিয়ে নিলেন।

যে সময়ে তিনি বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন তখন থেকে এই কয় বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। যে বছর জওহরলাল দেশে ফিরলেন সেই ১৯১২ সনে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস কেমন যেন একটা রাজনৈতিক ক্লান্তিতে থম থম করছিল। সে বছর বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। জওহরলাল সেই প্রথম একজন প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করলেন। কংগ্রেসে তখন মডারেট বা নরম-পন্থীদের প্রভাব। বহুমূল্য বিলিতি পোষাকে সজ্জিত হয়ে তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁর কাছে কংগ্রেসের এই অধিবেশন রাজনৈতিক জমায়েৎ অপেক্ষা একটা সামাজিক সম্মেলন বলেই মনে হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "তখন আমার মনে হয়েছিল যে কংগ্রেস ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সম্মেলন, এখানে ইংরেজী কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনাহীন সামাজিক সম্মেলন মাত্র।"

কিছুদিন পরে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হওয়ার জন্য নেহরু এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দিলেন। কাজেও কতকটা মন বসলো।

কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতে সাধারণ আইনজীবীদের মতো তাঁর ব্যারিস্টারির মোহ দূর হোল। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, এক লক্ষ্যহীন নীরস গতানুগতিকতার মধ্যে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, জওহরলালের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হোল যে সাত বছর বিলেতে বাস করার ফলে তাঁর যেসব অভ্যাস ও সংস্কার গড়ে উঠেছিল, বর্তমানের সঙ্গে তা একেবারেই খাপ খায় না।

তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "আমাদের বাড়ির ব্যবস্থা এবং পরিবেশ মোটামুটি ভালই ছিল। বাইরে বার-লাইব্রেরি ও ক্লাবে একই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দেখা হোত, একই পুরাতন কথা—বেশির ভাগ আলোচনাই আইন ব্যবসায় সংক্রান্ত—বার বার আলোচনা হোত। এই পরিবেশে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কিছুই নেই, আমার কাছে জীবন হয়ে উঠলো বিস্বাদ। এমন কি অবসর বিনোদনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থাও ছিল না।"

যাই হোক্, বিলেত থেকে ফিরে প্রথম কয়েক বছর জওহরলালের জীবন বিতৃষ্ণার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন। আদালতে প্রত্যহ যেতেন বটে, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করতেন না। রাজনীতি বলতে তিনি বুঝতেন, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল জাতীয়তামূলক কার্যপদ্ধতি; আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতেন যে, তখনকার অবস্থা এই পদ্ধতির অনুকূল নয়। কংগ্রেসে তিনি যোগদান করলেন, এর সাময়িক সভা-সমিতিতেও উপস্থিত থাকতেন। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তিনি তারো গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন।

সেই সময়ে একটি মানুষের প্রতি নেহরু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে।

বিলেতে ছাত্রজীবনে এঁকে তিনি প্রথম দেখেন। এখন দেশে ফিরে কংগ্রেসের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ জওহরলাল একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হোলেন। এর নাম "সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।" গোখ্‌লে ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সমিতির রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি তিনি খুব আকর্ষণ বোধ করেন, এর সামাজিক কার্যকলাপ তাঁকে মুগ্ধ করে। কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে এই সমিতির সদস্যগণ দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এই আদর্শটা তাঁর খুব ভাল লাগল। তাঁর মনে হোল, দেশে এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে অনন্যচিত্ত হয়ে নিরলসভাবে কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই সময়কার একটি ঘটনা।

এলাহাবাদে ছাত্রসভার একটি অনুষ্ঠান হোল।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। নেহরু ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা করতে উঠে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করবে, অনুগত থাকবে এবং কর্তৃপক্ষ যেসব নিয়ম-কানুন তৈরি করেছেন, যত্নের সঙ্গে তা পালন করবে।" জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেনঃ "এই শ্রেণীর নিরীহ উপদেশ আমার মোটেই ভাল লাগে না। প্রভুত্বের কাছে সবসময় অবনত থাকবে, এই গতানুগতিক উপদেশ দান আমার আদৌ ভাল লাগল না। একজন খ্যাতনামা নেতা যে ছাত্রদের বন্ধু ভাবে এমন উপদেশ দিতে পারেন, এ আমার ধারণাই ছিল না।"

১৯১৪।

য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল।

এই যুদ্ধের সংবাদে পৃথিবীর লোক সচকিত হোল।

ভারতবর্ষের লোকও সচকিত হোল।

যুবক নেহরুও সচকিত হোলেন। যদিও ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় এর বিশেষ প্রভাব তখনি দেখা দেয় নি, তবুও নেহরু সবিস্ময়ে দেখলেন ভারতরক্ষা আইন সমস্ত দেশকে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে। নেহরু বলেছেন, এই যুদ্ধকে তিনি মিশ্রিত ভাবের সঙ্গে দেখেছিলেন। তাঁর সহানুভূতি ছিল একমাত্র ফরাসী দেশের ওপর, কারণ তিনি ফরাসী সংস্কৃতির একজন প্রবল অনুরাগী ছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে যেমন, এখনো তেমনি পিতা ও পুত্র দুজনে মিলে সংবাদপত্র মারফৎ যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে এই নিয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনাও হোত।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৯৩ সনে তিনি ঐ দেশে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি করবার জন্য। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই ঔপনিবেশিক রাজ্যে শাদা ও কালোর বৈষম্য দেখে মোহনদাস মর্মাহত হন এবং এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি শুরু করেন এক অভিনব আন্দোলন। এরই নাম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৯১৩ সনে, গান্ধী যখন আড়াই হাজার ভারতীয় শ্রমিকদের পুরোভাগে নাটাল থেকে ট্রান্সভাল যাত্রা করেন, তখনি সর্বপ্রথম নেহরুর দৃষ্টিপথে আসেন এই অজ্ঞাতপরিচয় নিরীহ মানুষটি। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন জয়লাভ করে তখন থেকে নেহরুর অজ্ঞাত-সারেই তাঁর মন এই মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হোতে থাকে। তখন কে ভেবেছিল যে ভবিষ্যতে এই গান্ধী আর এই জওহরলাল—দুজনের মধ্যে দাঁড়াবে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক।

১৯১৫, ৯ই জানুয়ারি।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশে ফিরলেন।

সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয়তিলক তাঁর ললাটে।

শীর্ণদেহ, কৃশকায় এই মানুষটির অজেয় মনোবলের কাছে দক্ষিণ

আফ্রিকায় ব্রিটিশ-শক্তি পরাজয় স্বীকার করেছে—এই সংবাদ তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে তখন হোমরুল লীগের আন্দোলন ছিল বটে এবং যদিও স্বয়ং মতিলাল এই লীগের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি জওহরলাল নরমপন্থী রাজনীতির প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করতে পারলেন না। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-বিজয়ী গান্ধীর মধ্যে তিনি একজন ভাবী নেতার সন্ধান পেলেন এবং দূর থেকে সকলের অগোচরে একলব্যের মতোই তিনি এই মানুষটিকে তাঁর ভাবী রাজনৈতিক জীবনের গুরু বলে বরণ করলেন।

তখনো পর্যন্ত কোনো সাধারণ সভায় জওহরলাল বক্তৃতা করেন নি। বক্তৃতা করতে তাঁর ভয় ও সংকোচ বোধ হোত। তিনি জনসভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করা পছন্দ করতেন না, আবার হিন্দীতেও বক্তৃতা করার তেমন ক্ষমতা তখনো পর্যন্ত তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁর জীবনে এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "এই কালের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৬ সনে, ঠিক তারিখ মনে নেই, আমি এলাহাবাদের এক জনসভায় প্রথম বক্তৃতা করি। সংবাদপত্র দমনের নতুন আইনের প্রতিবাদে ঐ সভা ডাকা হয়েছিল। আমি সংক্ষেপে ইংরেজীতে কিছু বললাম। সভার শেষে সকলের সামনে বক্তৃতামঞ্চের ওপর আমাকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত করে ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন। তাঁর আনন্দের কারণ আমার বক্তৃতা নয়, জনসাধারণের কাজে আর একজন নতুন কর্মী পাওয়া গেল, এইজন্য। তখন জনসাধারণের কাজ বলতে বক্তৃতা করাই বোঝাত।"

এই তেজবাহাদুর সপ্রু ছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত মডারেট নেতা। মডারেট হোলেও তিনি অগ্রগামী মতের অনুসরণ করতেন। মতিলাল নেহরুর মতোই তিনিও তখন এলাহাবাদের

একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন আইনজীবী ছিলেন। এই সময়ে আর একজন প্রবীণ জননায়কের প্রতি জওহরলাল আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে সকলেই মালব্যজীকে পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন।

১৯১৬।

লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল।

এবারকার অধিবেশনে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানদের মিলন সম্পূর্ণ হয় এবং এই সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি গৃহীত হয়। জিন্না, আবদুল রসুল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগদান করেন। আগের বছর আনন্দভবনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসেছিল এবং সেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে মিলিত পরিকল্পনা রচিত হয়, তাই-ই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে গৃহীত হোল। মতিলাল খুব খুসি হোলেন, কারণ তিনি বরাবর এই অভিমতই পোষণ করতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের একতা ভিন্ন ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। পুত্র জওহরলালও মনে-প্রাণে পিতার এই অভিমত সমর্থন করতেন। পরবর্তীকালের জননায়ক জওহরলাল এই অভিমত আরো দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন ও সেই অনুযায়ী কাজ করতেন। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর গুরুর মতো তিনিই ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ।

এই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে জওহরলাল সর্বপ্রথম গান্ধীকে দেখেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য যাঁকে তিনি এতকাল মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন, আজ তাঁকে চাক্ষুষ দেখে তাঁর মনে যুগপৎ জাগল শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর কৌতূহল। মানুষটির চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না—অতি সাধারণ মানুষ। মাথায় একটা বিরাট পাগড়ি, গায়ে হাতকাটা একটা জামা, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, পায়ে সামান্য চটিজুতা

—ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যাঁকে জওহরলাল সর্বপ্রথম দেখলেন লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসে। কিন্তু মানুষটির মুখে-চোখে দেশপ্রেমের কী অপরূপ জ্যোতি—কী যেন একটা আত্মিকশক্তি তাঁর সমস্ত সত্তাকে ঘিরে রয়েছে—এ কথাও জওহরলালের মনে হোল।

এখানে তিনি আর একজনের সঙ্গে পরিচিত হোলেন।

তিনি সরোজিনী নাইডু।

লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসের পর, এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর কয়েকটি আবেগময়ী বক্তৃতা শুনে জওহরলাল যারপরনাই মুগ্ধ হোলেন। নারীকণ্ঠে এমন অপূর্ব বাগ্মিতা তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর বক্তৃতাগুলিতে জাতীয়ভাব ও দেশাত্মবোধের পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল। ঠিক এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে ভারতের ভাবী জননায়কের মনে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে; তিনি ক্রমে জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়ছিলেন আর তাঁর মন থেকে কলেজ-জীবনের অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাবগুলি প্রায় অন্তর্হিত হচ্ছিল।

দিন যায়।

নানাবিধ চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত দ্বন্দ্বে দোদুল্যমানচিত্ত জওহরলাল আইন ব্যবসায়ের প্রতি বিরক্ত হোয়ে উঠতে থাকেন। তবু তিনি কোর্টে যেতে থাকেন, কেন না আর কিছু করার ছিল না। ক্রমেই তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর সমস্ত চিত্ত জনসাধারণের কাজে, বিশেষ করে সংঘর্ষমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই চেতনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আইন ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের কথা, তুচ্ছ হয়ে যায় আনন্দভবনের বিলাস-বহুল জীবন। দেশজননী অলক্ষ্যে ডাক দেন দেশের ভাবী জননায়ককে।

১৯১৬। মার্চ মাস।

দিল্লীতে জওহরলালের বিয়ে হোল।

সেদিন ছিল বাসন্তী পঞ্চমী—বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। সেই

পুষ্পিত সমারোহের দিনে যুবক নেহরুর জীবনে প্রবেশ করলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী কমলা। রূপে ও গুণে সৌন্দর্যের প্রতিমা কমলার বয়স তখন সতেরো আর নেহরুর বয়স সাতাশ বছর। কাশ্মীরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ছিলেন কমলা। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষগণ অনেক-কাল আগে থেকেই দিল্লী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এঁদের পদবী ছিল কাউল।

আনন্দভবনের বধূ হয়ে যিনি জওহরলালের জীবনপথে আজ এলেন সেই তন্বী ও দীর্ঘাঙ্গী কমলা ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি উন্নতচরিত্রের নারী। নেহরুর যোগ্য জীবনসঙ্গিনী তিনি হতে পেরেছিলেন। তাই তো ১৯৩৬ সনে তাঁর মৃত্যুর পর নেহরু বলেছিলেন ঃ "কমলা আমার জীবনে শক্তি জুগিয়েছেন। তিনি আমার কাছে যুগপৎ শান্তি ও শক্তির প্রতিমাস্বরূপ ছিলেন।"

৪

"আমার জীবনে দুইজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব উল্লেখযোগ্য—আমার পিতা এবং মহাত্মা গান্ধী।" এই কথা বলেছেন জওহরলাল স্বয়ং। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একজনের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। তবে এ কথা সত্য যে জওহরলালের প্রথম জীবনে তাঁর পিতা মতিলাল নেহরুর প্রভাবই ছিল বেশি এবং তার পরেই যে মানুষটির প্রভাব তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করত তিনি হোলেন গান্ধী।

১৯১৬ সন থেকেই ভারতবর্ষে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিতে থাকে নতুন করে আর তার উত্তাপ নেহরু যে মাঝে মাঝে অনুভব না করতেন তা নয়, তবু আনন্দভবনে তখনো পর্যন্ত আগেকার বিলাস-বহুল জীবনধারাই প্রবাহিত ছিল। মতিলাল অসংখ্য ভৃত্যপরিবৃত হোয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তখনো দিনাতিপাত করছিলেন এবং তাঁর অভ্যস্ত জীবনধারায় কোনো পরিবর্তনই দেখা দেয়নি। কিন্তু পিতা ও পুত্রের জীবনে পরিবর্তন আসন্ন হয়ে আসছিল।

বিয়ের ঠিক এক বছর ন মাস পরে নেহরু ও কমলার একমাত্র সন্তান, কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়। ঠাকুরমা নাম রাখলেন ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী। ১৯১৭ সনে মহাযুদ্ধ শেষ হোল। সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবর্ষে এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা দেখা গেল। ভয় ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত আশা নিয়ে একটা বড়ো রকমের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিল ভারতবাসী। যুদ্ধে

মিত্রপক্ষ যাতে জয়লাভ করতে পারেন, সেজন্য ভারতবর্ষ অর্থবল ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেছিল। মহাত্মা গান্ধী নিজে এ বিষয়ে অনেকখানি সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি শাসকের সদিচ্ছায় যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি তাঁর গভীর আস্থা ছিল তাদের প্রতিশ্রুতিতে। যুদ্ধের পর শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হবে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাবে—সর্বত্রই লোকে এইসব কথা আলোচনা করত।

এমন সময়ে এলো রাউলাট বিল।

এই বিলের একটি ধারায় বলা হোল যে, সরকার প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে বিনাবিচারে গ্রেফ্তার ও বন্দী করতে পারবেন। উঠল সারা ভারতবর্ষে এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ—মডারেটরা পর্যন্ত এই বিলের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু সব প্রতিবাদই নিষ্ফল হোল। দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও ক্ষমতাগর্বী শাসকগণ ঐ বিল আইনে পরিণত করে ফেললেন। এই রাউলাট আইনকেই জওহরলাল স্বাধীনতার ছাড়পত্র বলে পরে উল্লেখ করেছিলেন। এই রাউলাট আইন থেকেই ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। শুধু নতুন অধ্যায় নয়—নবযুগের আরম্ভ হয়। এ যুগের নেতা গান্ধী। তাঁরই নেতৃত্বের ছায়াতলে আরম্ভ হয় জওহরলালের রাজনৈতিক জীবন।

গান্ধী সেই সময় ভীষণ অসুস্থ ছিলেন।

রোগশয্যা থেকেই তিনি বড়লাটকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রাউলাট বিলে সম্মতিদান না করেন। অনুরোধ ব্যর্থ হয়। গান্ধী গ্রহণ করলেন নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব। স্থাপিত হোল সত্যাগ্রহ সভা। রাউলাট আইন এবং সেইসঙ্গে আরো কতকগুলি দুর্নীতিমূলক আইন অমান্য করতে হবে—এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন সভার সদস্যবৃন্দ। অর্থাৎ তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে কারাবরণ করবেন।

এলাহাবাদে আনন্দভবনে বসে জওহরলাল এই সংবাদ পাঠ করলেন। তিনি লিখেছেন: "তখন যেন আমার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিলল।" তিনি মনে করলেন, এই কর্মপদ্ধতি হয়তো বা কার্যকরী হোতে পারে। উৎসাহে মেতে উঠলেন নেহরু; অবিলম্বে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন তিনি। "আইনভঙ্গ কারাগমন প্রভৃতির পরিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হোল না। আমার মনে হোল যেন কিছুই গ্রাহ্য করি না।"

কিন্তু সহসা তাঁর উৎসাহ নিভে যায়।

মতিলাল সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

এই কার্যপদ্ধতিতে তাঁর মন সায় দিল না।

পুত্রের প্রতি আসক্ত পিতার স্নেহ বাধার সৃষ্টি করল। তখন চলল জওহরলালের মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব। তবে পিতা ও পুত্র দুজনেই অনুভব করলেন যে, বড়ো রকমের একটা কিছু আসছে যা বর্তমানের জীবনধারাকে পাল্টিয়ে দেবে। এইসময়ে একবার মতিলালের অনুরোধে গান্ধী এলেন এলাহাবাদে। তাঁদের দুজনের মধ্যে যখন আলোচনা হয়, পুত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে আনন্দভবন থেকে ফিরবার সময় গান্ধী জওহরলালকে বললেন, "তাড়াতাড়ি কিছু করো না, তোমার বাবার মনে যাতে আঘাত লাগে সহসা এমন কিছু করা ঠিক হবে না।"

১৯১৯, ফেব্রুয়ারি।

তিনমাস হোল যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

তিনমাস পরেই শাসকজাতি পরাধীন ভারতবাসীকে উপহার দিলেন রাউলাট আইন। লোকে এর নাম দিলো কালাকানুন। ঠিক সেইসময়ে ভারত-সচিব ঘোষণা করেছেন নতুন শাসন-সংস্কার,

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার। মতিলাল প্রথমে এই সংস্কার গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন। পুত্র জওহরলাল কিন্তু এর বিপরীত মত পোষণ করলেন।

৩০শে মার্চ।

রাউলাট আইনের প্রতিবাদে সারা ভারতে সত্যাগ্রহ ঘোষণার নির্দেশ দিলেন গান্ধী। সত্যাগ্রহ দিবস যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়, সে কথাও তিনি বললেন। পরে তারিখটা পিছিয়ে ৬ই এপ্রিল করা হয়। সেই প্রথম যে সমগ্রজাতি এক মন এক প্রাণ হয়ে সরকারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। উত্তরপ্রদেশে সত্যাগ্রহ দিবস যাতে ঠিকভাবে পালিত হয়, জওহরলাল তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। সারা দেশে সে এক নতুন উদ্দীপনা—নতুন উন্মাদনা।

৬ই এপ্রিল যে সত্যাগ্রহ দিবস ধার্য হয়েছে, দিল্লী শহরে এই সংবাদ পৌঁছয়নি। ফলে সেখানে ভুলক্রমে ৩০শে মার্চই সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। শহরের প্রাচীনতম অঞ্চল চাঁদনীচকে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করল। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদে গৈরিকবসন পরিহিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলিম জনতার উদ্দেশে যখন বক্তৃতা করছিলেন, সেইসময় পুলিস ও মিলিটারি জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে কিছু হতাহত হয়।

৬ই এপ্রিল। সারা ভারতে সত্যাগ্রহ দিবস পালিত হোল। বহু শহরে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিস ও মিলিটারি নির্বিচারে গুলি-চালাল। পঞ্জাবের অমৃতসর ও লাহোরেই সরকারী অত্যাচার চরমে উঠল। পঞ্জাবে সামরিক আইনের ভয়াবহ অত্যাচার ও অপমানের কাহিনী যখন কয়েকমাস পরে সরকারী বিধিনিষেধের যবনিকা ভেদ করে জানাজানি হোল, তখন বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী

'জালিনওয়ালাবাগ'-এ অনুষ্ঠিত ডায়ারি অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী জানতে পারল।

১৩ই এপ্রিল।

অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের এক সভা আহূত হয়। জায়গাটার তিনদিক ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সুতরাং পালাবার পথ ছিল না, আত্মরক্ষারও উপায় ছিল না। জেনারেল ডায়ার নির্বিচারে গুলি চালালেন সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর। হাজার হাজার লোক হতাহত হয়। সমগ্র পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হোল। জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস কাণ্ড মতিলালের হৃদয়ে পরিবর্তন এনে দিলো। তিনি তখন গান্ধী ও পুত্র জওহরলালের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য মিলিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে প্রধান প্রধান অঞ্চলে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয় ও পুলিসের বাধা অপসারিত হয়। তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেতারা এলেন পঞ্জাবে সাহায্যদান ও অনুসন্ধান কাজের জন্য। তদন্তের ভার দেওয়া হল মতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের ওপর। ইনিই পরে দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' হিসেবে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেন। দেশবন্ধু অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার গ্রহণ করলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন সহকারীর প্রয়োজন হোল। গান্ধী বললেন—"জহরকে নাও।"

—জওহরলাল ? মতিলালের ছেলে ?

—হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে। দেশের কাজে এই বয়সেই প্রাণ সঁপে দিয়েছে।

—খুব ভাল। এইরকম ছেলেরই তো দরকার।

সেই প্রথম জওহরলাল দেখলেন দেশবন্ধুকে।

দেখেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে তাঁর মন ভরে উঠল।

তাঁর সঙ্গে একত্রে এবং তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে

তিনি কৃতার্থ হোলেন। এইখানে তিনি গান্ধীজীকেও ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন। পঞ্জাবের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেই সেদিন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ রাজদত্ত-সম্মান 'নাইট' খেতাব ফিরিয়ে দিয়ে বড়লাট চেমসফোর্ডকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন, সংবাদপত্রে একদিন সকালে সেই চিঠি পাঠ করে জওহরলাল কবির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সেইদিন থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে পরম সম্মানের চক্ষে দেখেন। এইভাবে সেদিন পঞ্জাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয় সমস্ত দেশকে আহ্বান জানিয়েছিল। সে আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন।

১৯১৯।

বড়দিনে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল।

সভাপতি—মতিলাল নেহেরু।

অমৃতসর কংগ্রেসই প্রথম গান্ধী কংগ্রেস। সমবেত প্রতিনিধি ও বিশাল জনতা গান্ধীজীর নেতৃত্বের জন্য উৎসুক হোল। তখন থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আকাশ 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হোতে থাকে। জাতীয় আন্দোলন নতুন সুরে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করল। জওহরলালের জীবনে ঘনিয়ে এলো নতুন দিন।

১৯২০। ৩০শে মে।

বোম্বাইতে বালগঙ্গাধর টিলকের মৃত্যু হোল।

মহাত্মা গান্ধী অনুভব করলেন যে টিলকের শূন্য স্থান এখন তাঁকেই পূর্ণ করতে হবে। চৌপাট্টির সমুদ্রতীরে যখন লক্ষ জনতার সমক্ষে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় টিলকের মরদেহ ভস্মীভূত হয়, তখন গান্ধী ও জওহরলাল দুজনেই সেখানে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কংগ্রেসের এই মহান্ নেতার জীবনব্যাপী ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নির্ভীক সংগ্রাম—টিলককে সেদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার আসনে বসিয়েছিল। টিলকের দেশ-

প্রেম তরুণ জওহরলালের প্রাণে গভীর প্রেরণা দিয়েছিল। তাই তাঁর পিতার সামনে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের জননায়ক জওহরলাল হয়ত এই প্রতিজ্ঞাই করে থাকবেন মনে মনে যে, সর্বস্বপণ করেই ভারত-বর্ষকে বিদেশীশাসনমুক্ত করব। প্রয়োজন হোলে এরজন্য কারা-বরণ পর্যন্ত করতে ভয় পাব না।

কেমন করে নেহরু তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করলেন, এইবার বলব তাঁর জীবনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

১৯২০, জুন মাস।

প্রতাপগড় জেলার পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত একটা পল্লী-অঞ্চল থেকে প্রায় দুশো কৃষক এলাহাবাদ শহরে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তারা স্থানীয় নেতাদের দৃষ্টি তাদের দুঃখদুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করবে। যমুনার একটা ঘাটে নদীতীরে তারা আস্তানা ফেলেছে। খবর শুনে জওহরলাল গেলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। তালুকদাররা কেমন করে জোর করে টাকা আদায় করে, কি রকম অমানুষিক অত্যাচার করে—এবং তাদের অবস্থা এখন কি রকম অসহ্য হয়ে উঠেছে—এইসব দুঃখের কাহিনী তারা যখন বর্ণনা করল, তাই শুনে তিনি যারপরনাই ব্যথিত হোলেন।

—বাবুজী, আপনি নিজে একবার গিয়ে দেখুন, আমাদের কি অবস্থা। তালুকদারদের অত্যাচার আর সহ্য হয় না। বলুন আপনি যাবেন ?—এই বলে তারা নেহরুকে আঁকড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে।

সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পাকা রাস্তা থেকে অনেক দূরে গ্রামগুলি অবস্থিত।

কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে জওহরলাল এলেন গ্রামে। থাকলেন সেখানে তিন দিন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "এ আমার নিকট নতুন আবিষ্কার। আমি দেখলাম, পল্লীবাসীরা এক অপূর্ব

উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনায় মেতে উঠল। মুখে মুখে সংবাদ দিলে গ্রামান্তর থেকে হাজার হাজার নরনারী বালকবালিকা সভাস্থলে উপস্থিত হোল। তাদের পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ, চক্ষে এক মহৎ সম্ভাবনার দীপ্তি।"

ভারতের প্রাণ গ্রাম।

গ্রামের প্রাণপুরুষ কৃষক।

সেই কৃষকদের এই প্রথম দেখলেন জওহরলাল।

তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের দুর্দশা দেখে তাঁর প্রাণ ব্যথায় ও সমবেদনায় ভরে উঠল। নিজের নিশ্চিন্ত আরামের জীবনের জন্য লজ্জাবোধ করলেন তিনি। "ভারতের অর্ধনগ্ন এই বিশাল জনসংঘকে অগ্রাহ্য করে আমাদের নাগরিক সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য লজ্জিত হলাম। ভারতের এই অসহনীয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন দেখে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হোলাম। নগ্ন ক্ষুধিত বক্র মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে অসহায় এক নতুন ছবি আমার মানসপটে উদিত হোল।"

জওহরলাল শুনলেন তাদের দুঃখের কাহিনী।

খাজনার হার বেড়েছে, জমি থেকে উচ্ছেদ চলেছে।

তাদের অস্তিত্বকে ঘিরে আছে জমিদারের গোমস্তা, মহাজন আর পুলিস। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যা উৎপন্ন হয়, তার মালিক তারা নয়। তাদের ভাগ্যে জোটে শুধু পদাঘাত, গালি আর ক্ষুধিত উদর। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রথা চলে আসছে। কিন্তু আজ কোথা থেকে দেখা দিল এই জাগরণ?—ভাবলেন জওহরলাল।

প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা—এইসব অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন স্বচক্ষে দেখে জওহরলাল বুঝলেন, জনসাধারণ থেকে তিনি কত বিচ্ছিন্ন।

ভারতের কৃষক নেহেরুর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল।

প্রতাপগড় জেলায় পরিভ্রমণের পর থেকেই তাঁর মধ্যে এলো এক নতুন অনুভূতি। তাঁর ধ্যানে ভারতবর্ষের এই নগ্নদেহ ক্ষুধিত জনসাধারণ ছাড়া আর কিছু রইল না। জড়তা দূর হোল। তখন থেকে জওহরলাল প্রকাশ্য সভায় কৃষকদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। বাগ্মিতা কৌশল তখনো পর্যন্ত তিনি আয়ত্ত করতে শেখেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন : "আমি মানুষের সঙ্গে মানুষ যেমন সাধারণভাবে কথা বলে তেমনি করে তাদের কাছে আমার মনের কথা, আমার হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করলাম। লোকসংখ্যা দশজন হোক বা দশ হাজারই হোক আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করতাম।"

তখন নেহরুর মা ও স্ত্রী মুসৌরিতে। তাঁদের দেখতে তিনি মুসৌরি এসেছেন। কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারলেন না সেখানে ; কৃষকদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হোলেন। যুক্তপ্রদেশকে তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিলেন তিনি। তখন ১৯২১ সন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। সুদূর পল্লীতেও গিয়ে পৌঁছেছে সেই আন্দোলনের বার্তা। প্রত্যেক জেলায় কংগ্রেস কর্মীরা নতুন বাণী প্রচারের জন্য পল্লীতে যেতেন। কৃষকদের দুর্দশায় প্রতিকার হবে, এমন কথাও তাদের মুখে শোনা যেত। স্বরাজের কথা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে আর সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে অহিংসার বাণী। সে বাণী কৃষকদের হৃদয় স্পর্শ করল।

দেখতে দেখতে সমস্ত যুক্তপ্রদেশে অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। রায়বেরিলিতে কৃষকদের ওপর গুলি চলেছিল। তখন নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। নাগপুর থেকে এলাহাবাদে ফিরবার পরেই জওহরলাল রায়বেরিলি থেকে তারবার্তা পেলেন—তিনি যেন অবিলম্বে সেখানে চলে আসেন। তিনি পরের দিনই রওনা হোলেন। সেখানে

পৌঁছে তিনি খবর পেলেন যে কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন কৃষক-নেতা গ্রেপ্তার হয়ে জেল হাজতে আটক আছেন। তিনি আরো শুনলেন যে এক জায়গায় সৈন্যদল কৃষকদের পথরোধ করে আছে।

নেহরু তাড়াতাড়ি সেইদিকে অগ্রসর হন।

পথেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এক পত্র পেলেন।

পত্রে লেখা আছে—তিনি যেন এখনি ফিরে যান।

ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির উল্টো পিঠেই জওহরলাল লিখে দিলেন: "আপনি কোন্ আইনের কোন্ ধারায় আমাকে ফিরে যেতে বলছেন তা আমি জানতে চাই এবং তা না জানা পর্যন্ত আমি বিরত হব না।" সেইখানে জওহরলাল স্বচক্ষে দেখলেন স্বৈরাচারী শাসনের নমুনা আর দেখলেন নিরস্ত্র কৃষকদের ওপর গুলিবর্ষণ। কংগ্রেস থেকে তখন চরকার প্রচলন হয়েছে। এই চরকাই রাজদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠল। রায়বেরিলি ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চল শত শত ব্যক্তির গ্রেফ্তার, কৃষক ও কংগ্রেস আন্দোলন দমনের চেষ্টা এবং ফৈজাবাদ জেলায় ব্যাপক দমননীতি—স্বচক্ষে এইসব প্রত্যক্ষ করলেন নেহরু। আর সর্বত্র জনসাধারণের কণ্ঠে তিনি শুনলেন একটি মানুষের নামে জয়ধ্বনি। তিনি মহাত্মা গান্ধী। জওহরলালের চোখ থেকে একটা আবরণ সরে গেল। দেশের কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

৫

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা খরতর বেগে দেশের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। এ সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধী। নাগপুর কংগ্রেসে দেশবাসী গান্ধীর অহিংস অসহযোগের কার্য-পদ্ধতি গ্রহণ করল। তিনি দেশবাসীকে আশ্বাস দিলেন: "যদি আমার আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি এক বছরের মধ্যেই তোমরা স্বরাজ-লাভ করতে পারবে।"

এক বছরের মধ্যে স্বরাজ !

তড়িৎপ্রবাহের মতো এই বাণী ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

সকলে এসে সমবেত হোল কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার তলে। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত হোল এক পরাধীন জাতির অহিংস সংগ্রাম। সমস্ত পৃথিবী সবিস্ময়ে সেই সংগ্রামের পরিণতির জন্য সেদিন প্রতীক্ষা করেছিল। কটিবাস পরিহিত কৃশতনু একটি মানুষের আহ্বানে ভারতের সমস্ত নগর, জনপদ ও পল্লীগ্রাম যে স্বাধীনতালাভের জন্য দুর্জয়পণ গ্রহণ করবে—শাসকবর্গ তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

কংগ্রেস রাজনীতিতে এবার আরম্ভ হোল গান্ধীযুগ।

সারা দেশ পরিভ্রমণ করলেন গান্ধীজী।

সামনেই ছিল নতুন নির্বাচন। গান্ধীর নির্দেশে দেশের জনসাধারণ সে নির্বাচন বর্জন করল—তারা ভোটদানে বিরত হোল।

আইন-সভা বর্জিত হোল। সরকারের প্রতিনিধিরা দেখলেন ভোট-দানের কেন্দ্রে একটি ভোটদাতাও হাজির হোল না। জনসাধারণের ওপর গান্ধী তথা জাতীয় কংগ্রেসের এই প্রভাব দেখে রাজশক্তি প্রমাদ গণলেন। ১৯২১-এর ভারতবর্ষ ছিল এমনি প্রাণ-চঞ্চল।

গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়ালেন মতিলাল নেহরু। দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন। এঁরা তিনজনেই ইংরেজের আদালত বর্জন করে ত্যাগ করলেন আইন-ব্যবসায়। ত্যাগ করলেন বিলাসিতাময় অভ্যস্ত জীবন। অসহযোগ করলে আইন-ব্যবসায় বর্জন করতে হয় আর তার মানে জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজা। তখন মতিলালের বয়স ষাট বছর। সামাজিক মর্যাদা, ব্যয়বহুল বিলাসব্যসন—এ সবই তিনি এক কথায় ছাড়লেন। ভোগবাদী মতিলাল ও দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নামলেন, তখন সেই দৃষ্টান্ত দেখে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন। এলেন বল্লভভাই প্যাটেল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে থেকে কত নতুন কর্মী।

এলেন জওহরলাল নেহরু।

এলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র তখন সবেমাত্র সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। দেশে ফিরবেন, এমন সময়ে বিলেত থেকেই এইসব খবর পেলেন তিনি। দেশবন্ধুকে পত্র লিখে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন তরুণ সুভাষ—"আমি আই সি এস.-এর চাকরি করব না; দেশের কাজ করব।" তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে বাংলার সুভাষ আর আনন্দভবনের জওহরলাল সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এঁরা দুজনেই হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করলেন গান্ধী যেন ভারতের কানে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন: "মুক্ত হও; ক্রীতদাস থেকো না।"

এই মন্ত্র কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে এক নতুন চেতনার

সঞ্চার করল। দেশজননীর শৃঙ্খলবন্ধন মোচনের জন্য নবীন সৈনিকের দল এগিয়ে এলেন। তাদের পুরোভাগে দেখা গেল আগাগোড়া খদ্দর পরিশোভিত আর মাথায় খদ্দরের টুপি জওহরলালকে।

দিন যায়।

অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হোতে থাকে।

নতুন আইন-সভার নির্বাচন বর্জন সফল হয়েছে।

কংগ্রেসের সমস্ত পুরাতন নেতারা এখন অসহযোগের ভূমিতে এসে মিলিত হয়েছেন। তিনমাসের মধ্যেই আন্দোলনের সাফল্য দেখে তাঁদের সংশয় দ্বিধা দূর হোল। কংগ্রেস এখন জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। আবেদন-নিবেদনের যুগ শেষ হোয়ে এখন দেখা দিয়েছে সংগ্রামের যুগ। জনসাধারণের ওপর কংগ্রেসের এখন আশ্চর্য-প্রভাব। সারা দেশে জেগে উঠেছে স্বাধীনতার নবীন আকাঙ্ক্ষা। জাতি হয়েছে নির্ভীক—সে এখন মেরুদণ্ড সোজা করে বলতে শিখেছে ঃ

বল বীর,
উন্নত মম শির,
শির নেহারি মোর নতশির ঐ হিমাদ্রির।

দেশের সেইসময়কার উন্মাদনাময় রাজনৈতিক পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে জওহরলাল লিখেছেন ঃ "আমাদের চোখের সামনে ভারতের এই দ্রুত পরিবর্তন দেখে আমরা বিশ্বাস করতাম স্বাধীনতা এগিয়ে আসছে। আমাদের রাজনৈতিক কার্যের সাফল্যে আমরা আনন্দিত হোতাম। আমাদের নৈতিক শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিহ্বল হোলেন। তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না যে কি ঘটছে। মনে হোতে লাগল, ভারতে তাঁদের পরিচিত প্রাচীন ব্যবস্থা উলটপালট হয়ে যাচ্ছে।"

তখন লর্ড রেডিং বড়লাট।

১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি বললেন: "আমরা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি।"

সত্যিই তাই। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে জোর করে দাবিয়ে রাখার কোনো পথই সরকার খুঁজে পেলেন না।

১৯২১।

জওহরলালের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

তিনি এখন পুরোপুরি আন্দোলনের মধ্যে ডুবে গেলেন।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলাধূলা, বই পড়া—সব ছেড়ে দিলেন। সংবাদপত্রও ভাল করে পড়ার সময় নেই এখন। এমন কি পরিবার-পরিজনের চিন্তাও কমে আসতে লাগল—ভুলে গেলেন নিজের স্ত্রী ও কন্যার কথা। কংগ্রেস আর জনসাধারণ—এই নিয়ে এখন তাঁর দিন কাটে। তখনকার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে জওহরলাল লিখেছিলেন: "পল্লীতে প্রচার করা—ইহাই ছিল কংগ্রেসের বাণী। আমরা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে শস্যক্ষেত্র ও প্রান্তর অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে গ্রামে যেতাম এবং কৃষকসভায় বক্তৃতা করতাম। জনগণের চিত্তের আবেগ আমাকে মুগ্ধ করত। তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার শক্তির অনুভূতিতে আমি পুলকিত হোতাম, জনতার মনোভাব আমি গ্রামে বুঝতে পারলাম। আমি জনতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সোজা তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হোতাম।"

এমনি করেই সেদিনের তরুণ কংগ্রেস কর্মী জওহরলাল ধীরে ধীরে জাতির হৃদয় সিংহাসনে 'জননায়ক জওহরলাল' হিসেবে তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন। এমনি করেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের আদর্শকে আর অহিংসা-অসহযোগের বাণীকে নিজের জীবনে ফুটিয়ে

তুলতে লাগলেন। গান্ধীর শান্তশিষ্ট আচার-আচরণের অন্তরালে তিনি যেন একটা প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরির আভাস পেতেন—অনুভব করতেন তার উত্তাপ। তাঁর পিতার সঙ্গে আকৃতি এবং প্রকৃতিতে এই মানুটির কত তফাৎ; বরং গান্ধী ছিলেন মতিলালের বিপরীত। মেজাজে ও চেহারায় দুজনের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটা রাজকীয় মর্যাদার ভাব ছিল। এই দুইজনই তখন জওহরলালের জীবনে তাঁদের গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

যতই অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে ততই শুরু হয় শাসকজাতির নির্যাতন। কয়েকজন কংগ্রেস নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খান আবদুল গফুর খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং রাজদ্রোহমূলক কাজের জন্য তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড হয়েছে। জওহরলাল কাগজে পড়লেন এই সংবাদ। জুলাই, ১৯২১। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিলাতি-বস্ত্র বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পরিবর্তে হাতে কাটা ও হাতে বোনা খদ্দরের প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হোলেন। বিলাতি মদের দোকানগুলি পর্যন্ত বর্জিত হোল। জুলাই মাসের শেষদিনটিতে বোম্বাইতে প্রকাশ্য স্থানে বিলাতি কাপড়ের যে বহ্ন্যুৎসব হয়, তাতে গান্ধী সভাপতিত্ব করলেন।

গণ-আন্দোলনের গতি দুর্বার হয়ে উঠল।

এখানে-ওখানে জ্বলে উঠল বিপ্লবের অগ্নিশিখা।

মালাবারে দেখা দিল মোপলা বিদ্রোহ।

সরকার কঠিন হস্তে দমন করেন সেই বিদ্রোহ।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। যুক্তপ্রদেশেও ঐরকম ইস্তাহার জারি হয়েছে। দেশবন্ধু এই সময় এক উদ্দীপনাময়ী বাণীতে বললেন: "আমি দেহে লৌহশৃঙ্খলভার ও

মণিবন্ধে হাতকড়ির স্পর্শ অনুভব করছি। ইহা পরাধীনতার বন্ধনের বেদনা। সমস্ত ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার। কংগ্রেসের কাজ চালাতে হবে। আমি বন্দী হই কি বাইরে থাকি, কি আসে যায়? আমি বাঁচি কিংবা মরি তাতেও কিছু আসে যায় না।"

সমস্ত ভারতবর্ষ এক বৃহৎ কারাগার!

কথাটি স্পর্শ করল জওহরলালের হৃদয়।

একদিন।

এলাহাবাদের কংগ্রেস অফিসে বসে জওহরলাল কাজ করছেন এমন সময় একজন এসে খবর দিল, "পুলিস এসেছে খানাতল্লাসীর পরওয়ানা নিয়ে—সমস্ত অফিসবাড়ি তারা ঘিরে ফেলেছে।" তিনি বুঝলেন এতদিনে সংকট বুঝি ঘনিয়ে এলো। কারাগার তখনো অজ্ঞাত স্থান, সেখানে যাওয়া এক নতুন অভিজ্ঞতা। যাই হোক, তিনি বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখেন যে বৃহৎ বাড়ির কতকাংশে পুলিস খানা-তল্লাসী আরম্ভ করেছে এবং তিনি আরো জানতে পারলেন যে পুলিস আনন্দভবনে হানা দিয়েছে মতিলাল ও তাঁর পুত্রকে গ্রেফ্তার করার জন্য।

ডিসেম্বর মাস। বড়দিন।

ইংলণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শনে।

বিক্ষুব্ধ, অশান্ত ভারতকে এই উপায়ে শান্ত করা যেতে পারে, এই রকম একটা মতলব নিয়েই বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেওয়া হোল—যুবরাজের অভ্যার্থনা বর্জন করা হোক। তাই হোল। ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেইখানেই তিনি দেখেছেন হরতাল আর জনশূন্য রাস্তা। তিনি যেদিন এলাহাবাদে এলেন সেদিন সমস্ত নগরী মৃতের মতো নিস্তব্ধ ছিল। কয়েকদিন পরে তিনি যখন কলিকাতায় উপস্থিত হোলেন, কর্মকোলাহল মুখর সেই বিশাল নগরীর

প্রাণ-স্পন্দন যেন সহসা থেমে গেল। কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল না। সরকারের মর্যাদা ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডের ধূম পড়ে গেল। এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও নেতারা বন্দী হোলেন। হাজার হাজার নেতা ও যুবক কারাগারে চলে গেলেন। জওহরলাল লিখেছেন ঃ "কারাযাত্রী অজস্র স্বেচ্ছাসেবকের যেন শেষ নেই। যুবক ও বালকেরা পুলিসের কয়েদী গাড়িতে উঠে বসত এবং কিছুতেই নামতে চাইত না। পঞ্জাব ও বিহারেও চলল গ্রেফ্‌তারের ধূম।"

৬ই ডিসেম্বর। ১৯২১।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। সারাদিন কাজের পর জওহরলাল ফিরেছেন আনন্দভবনে। এসে দেখলেন পুলিস তাঁদের বাড়ি খানা-তল্লাস করছে। তারা এসেছিল গ্রেফ্‌তারি পরওয়ানা নিয়ে—মতিলাল ও জওহরলালকে গ্রেফ্‌তার করা হবে। পিতা ও পুত্র একসঙ্গে ধৃত হোলেন—একই গাড়িতে বসিয়ে তাঁদের জেলে নিয়ে যাওয়া হোল। পরের দিন আদালতে পিতা-পুত্রের বিচার হোল। বিচারে দুজনের দু'মাস করে কারাদণ্ড হোল। লক্ষ্ণৌ জেলে তাঁদের রাখার ব্যবস্থা হোল। ডিসেম্বর, ১৯২১ আর জানুয়ারি, ১৯২২—এই দু'মাসে ভারতবর্ষে ত্রিশ হাজার কংগ্রেস নেতা ও কর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ জেলে কারাবাসের দিনগুলি ধীর-মন্থর গতিতে কাটতে লাগল। বৈচিত্র্যহীন বন্দীজীবন। আন্দোলনের নেতা গান্ধী ছিলেন বাইরে—বাইরে থেকেই তিনি নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। সম্ভবত তাঁর জনপ্রিয়তা অনুধাবন করেই সরকার অনুমান করলেন যে, গান্ধীকে গ্রেফ্‌তার করা

বিপজ্জনক—হয়ত বা সৈন্য ও পুলিসবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এইজন্যই তাঁকে তখন গ্রেফ্‌তার করা হয় নি।

১৯২২। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ।

হঠাৎ ঘটনার স্রোত ফিরে গেল।

লক্ষ্ণৌ জেলে বসে একদিন জওহরলাল শুনলেন—গান্ধীজী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি প্রত্যাহার করেছেন। সংঘর্ষমূলক আন্দোলন স্থগিত হয়েছে। এই সংবাদে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হোলেন। চৌরিচৌরার ঘটনাই নাকি গান্ধীর মতের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে গ্রামবাসীদের ওপর পুলিস গুলিবর্ষণ করে। উত্তেজিত গ্রামবাসী হানা দেয় পুলিস থানার ওপর। সেখানে ছিল বাইশজন কনস্টেবল। জনতা থানা জ্বালিয়ে দেয়—কনস্টেবলগুলি দগ্ধ হয়ে মারা যায়। গান্ধী এই ঘটনায় বিচলিত হন। অহিংসা হিংসার রূপ নিতে চলেছে। তাই তিনি সহসা আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ জেলে বসে মতিলাল ও জওহরলাল দুজনেই গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হোলেন। দেশব্যাপী এই বিরাট আন্দোলন এই-ভাবে হঠাৎ স্থগিত রাখার অর্থ কি স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরত হওয়া নয়? তাঁদের মনের মধ্যে জাগে নানা প্রশ্ন। তাঁরা কিছুতেই গান্ধীর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন "যখন আন্দোলন সকল দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমরা প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য লাভ করছিলাম, এমন সময়ে এভাবে আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় আমরা ক্রুদ্ধ হোলাম! কিন্তু কারাগারে বসে আমাদের এই ক্রোধ ও নৈরাশ্য কোনো কাজেই এল না।"

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জওহরলাল কারামুক্ত হোলেন। তিনি আনন্দভবনে কিছুদিন কাটিয়ে

আমেদাবাদ যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য—সেখানে গান্ধীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। কিন্তু জওহরলাল পৌঁছবার আগেই, ১০ই মার্চ শুক্রবার গান্ধী বন্দী হোলেন এবং এক সুদীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হোলেন। আদালতে যখন গান্ধীর বিচার হয়, জওহরলাল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্যর রবার্ট ব্রুমফিল্ড নামে একজন ইংরেজ জজের আদালতে এই বিখ্যাত বিচার হয়েছিল।

বিচারে গান্ধীর ছ'বছর কারাদণ্ড হয়।

এই ঘটনার ঠিক তেরো বছর আগে টিলকের ছ'বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। সেদিন আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দোষী স্বীকার করে গান্ধী বলেছিলেনঃ "অসহযোগের পথ প্রদর্শন করে আমি ভারত ও ইংলণ্ডের উপকার করেছি।" গান্ধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় বিচারপতি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেদিন বলেছিলেনঃ "ভবিষ্যতে যদি ঘটনার পরিবর্তন হয়, ভারত সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই যদি আপনাকে কারামুক্ত করেন, তাহোলে আমার চেয়ে আর কেউ সুখী হবে না।" জজের সৌজন্যে জওহরলাল মুগ্ধ হোলেন।

গান্ধী চলে গেলেন সবরমতী জেলে।

জওহরলাল বিষণ্ণচিত্তে ফিরে এলেন।

তাঁর মানসপটে শুধু আঁকা রইল গান্ধীর মূর্তি ও জীবন্ত ভাষা।

আমেদাবাদ থেকে সোজা এলাহাবাদে ফিরলেন জওহরলাল।

সারাপথ তিনি হিংসা ও অহিংসার কথা চিন্তা করলেন। মনে পড়ল ১৯২০ সনে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লেখা গান্ধীর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ—'তরবারির পথ'। প্রবন্ধটি তিনি খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন; প্রায় সবটাই তাঁর মনে ছিল। মনে পড়ল গান্ধীর সেই কথাগুলিঃ "যেখানে সমস্যা কাপুরুষতা না বলপ্রয়োগ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সেখানে বলপ্রয়োগ করতেই বলব। ভারতবর্ষ

কাপুরুষের মতো নিরুপায় হয়ে অসীম অমর্যাদা বহন করছে, এই দৃশ্য অপেক্ষা বরং আমি দেখতে চাই, সে তরবারি হস্তে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অহিংসা হিংসা থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর এবং শাস্তিদান অপেক্ষা ক্ষমা অধিকতর পৌরুষ-ব্যঞ্জক।"

অহিংসা হিংসার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।

মহামানব বুদ্ধ বলেছিলেন এই কথা একদিন।

সম্রাট অশোক বুদ্ধের এই বাণীকে কার্যে পরিণত করেছিলেন। ভারত-ইতিহাসের এই ঘটনারই কি পুনরুক্তি হতে চলেছে আজ মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে?—চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে নিজের মনে এইসব কথা চিন্তা করতে থাকেন জওহরলাল।

আমেদাবাদ থেকে ফিরে জওহরলাল নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। বন্ধু ও সহকর্মীরা কারাগারে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছে। তিনি আবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। এবার তাঁর ঝোঁক পড়ল বিলিতি কাপড় বয়কটের দিকে। স্থির করলেন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দোকানে দোকানে পিকেটিং করতে হবে। দু'দিন পরেই তিনি আবার গ্রেফ্‌তার হোলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হোল। আদালতে জওহরলাল আত্মপক্ষ সমর্থন না করে একটা বিবৃতি দিলেন। বিচারে এবার তাঁর এক বছর ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হোল।

৬

লক্ষ্ণৌ জেলে দিনগুলি এখন কাটে জওহরলালের।

তাঁর কারাবাসের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন ঃ "জেলের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে দেওয়া হোত। আমরা দৈনিক সংবাদপত্র পেতাম। তাতে নতুন গ্রেফ্‌তার ও আন্দোলনের সংবাদ কারাজীবনের একঘেয়েমির মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করত। লেখাপড়ার সময় আমি খুব কমই পেতাম। সকালবেলায় উঠে আমাদের চালা ঘরখানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতাম। পিতার ও আমার নিজের কাপড় কাচতাম এবং কিছু সময় চরকায় সূতা কাটতাম। তখন শীতকাল, উত্তর ভারতের আবহাওয়া এই সময়টা খুব ভালো। সন্ধ্যাবেলায় আমরা 'ভলিবল' খেলতাম।"

মাঝে মাঝে বন্দীজীবনের দুঃসহতা দূর করার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠত। তিনি নির্জনে থাকতে ইচ্ছা করতেন। তখন পিতা-পুত্র দুইজনেই নৈনি জেলে। জেলের যে ব্যারাকে থাকার জন্য তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তার বাইরে পাঁচিলের ধারে গিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকুতে যখন জওহরলাল বসতেন, তখন যেন তিনি একটু নির্জনতার স্বাদ পেতেন। "তখন বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ থাকত বলে এর সুযোগ গ্রহণ করতাম। কি রৌদ্রের তাপ, এমন কি বৃষ্টিতে ভিজেও যতটা সময় পারতাম ব্যারাকের বাইরে থাকতে চেষ্টা করতাম। সেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে শুয়ে আমি ওপরে আকাশে মেঘের দিকে চাইতাম।

জীবনে কখনো এমন আগ্রহ নিয়ে আকাশে মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র্যের এত রূপ দেখিনি।”

কিন্তু সুখের দিন বেশিদিন রইল না।

ক্রমে রাজবন্দীদের ওপর বিধিনিষেধের কড়াকড়ি হোতে লাগল। কঠোরতর নিয়ম প্রবর্তিত হোল। এই নিয়ে জেলকর্মী ও রাজবন্দীদের মধ্যে বিরোধ বাধল। তখন লক্ষ্মৌ জেলে কয়েক শত বন্দী ছিলেন। নতুন ব্যবস্থার প্রতিবাদে তাঁরা কিছু দিনের জন্য বাইরের আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলেন। তখন সরকার বন্দীদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করলেন, খবরের কাগজ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

খবরের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হোল বটে, কিন্তু বাইরের কিছু কিছু সংবাদ বন্দীরা পেতেন। সেইসব অসংলগ্ন ও টুকরো সংবাদ থেকে জওহরলাল জানতে পারলেন যে, বাইরের আন্দোলনে ভাঁটার টান ধরেছে। কংগ্রেস দুইদলে ভাগ হয়ে গিয়েছে—এক দল চাইছেন পরিবর্তন, অপর দল পরিবর্তনের বিরোধী। এক দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু। আর পরিবর্তন-বিরোধী দলের নেতা ছিলেন মাদ্রাজের চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। গান্ধী তখন কারাগারে। দেশবন্ধু ও মতিলালের মতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত এবং সম্ভব হলে ঐগুলি দখল করা উচিত।

দেশে তখন চলেছে দ্বৈতশাসন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলেই এই শাসনবিধি প্রচলিত হয়। শাসন-ব্যবস্থা দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং কতকগুলি বিষয়ের শাসনদায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। প্রথমে আইন-সভা বয়কট করলেও এখন দেশবন্ধু ও মতিলাল সিদ্ধান্ত করলেন যে আইন-সভার ভিতরে প্রবেশ করে দ্বৈতশাসন অচল করতে হবে। এরই

পরিণতি স্বরাজ্য দল। কংগ্রেসের মধ্যেই এই নতুন দলের জন্ম হয় এবং মতিলাল ও দেশবন্ধু প্রমুখ পরিবর্তন-প্রয়াসী নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় স্বরাজ্যদল অল্পদিনেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯২৩। জানুয়ারির শেষ।

জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীই মুক্তি পেলো।

জেলের বাইরে এসে তিনি দেখলেন কংগ্রেসী রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক। তিনি স্বয়ং আইন-সভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এর ফলে হয়ত আপোষ-রফার মধ্যে পড়তে হবে। মতিলাল ও দেশবন্ধু জাতীয় সংগ্রামকে আইন-সভার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। যাই হোক, জেল থেকে বেরিয়ে জওহরলাল আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে দুইদলের মধ্যে আপোষ-রফার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনোই ফল হোল না।

জওহরলাল কি করেন? অগত্যা তিনি কংগ্রেসের গঠনকার্যে মন দিলেন। তিনি তখন যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। কাজই বা করবেন কি—কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা তখন ছিল না। কংগ্রেসে একরকম ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছে, নির্দেশই বা কে দেবে? ঐ বছরে ভারতবর্ষের কয়েকটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। জওহরলালও এই নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর ওপর একটা নতুন দায়িত্ব এলো।

তিনি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করলেন। এতদিন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন, এখন সর্বভারতীয় সম্পাদক হওয়ার ফলে তাঁর কাজ শতগুণে বেড়ে গেল। তাঁর কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন

বিচারপতি মারফৎ একটি প্রস্তাব তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। তাঁকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং বলা হয় যে যদি তিনি সম্মত থাকেন তবে তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী করা হবে।

সে সময়ে এ কম প্রলোভনের কথা ছিল না।

কিন্তু সরকারের এই কৌশলপূর্ণ প্রস্তাব ব্যর্থ হয়।

পরাধীন ভারতে এরকম মন্ত্রীর মূল্য কতটুকু? তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "মন্ত্রীরূপে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না এবং নিশ্চয়ই এর মতো ঘৃণার জিনিস আমার কাছে আর কিছু নেই।" জওহরলাল জানতেন ঐকালে মন্ত্রীগিরি কত সস্তা; তাই তিনি সরকারের প্রস্তাবে রাজী হোলেন না।

দিন যায়।

মতিলাল তখন স্বরাজ্যদল নিয়ে মেতে উঠেছেন।

দেশবন্ধু জওহরলালকে অনুরোধ করলেন স্বরাজ্যদলে যোগ দেওয়ার জন্য। তাঁর যুক্তি ছিল জোরালো এবং তা সহজে প্রত্যাখ্যান করার মতো ছিলনা। তবু তাঁর মন সায় দিল না। তিনি কংগ্রেসের পরিবর্তন-বিরোধী দলের মধ্যেই থেকে কংগ্রেসের কাজই করতে লাগলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে গান্ধীর কারামুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আনন্দভবনের তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করে ফকির হয়েছিলেন, মতিলাল নেহরুও তেমনি দেশের ডাকে সব ত্যাগ করেছিলেন। দেশের কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে দেখা গেল যে আনন্দভবন আগের চেয়ে অনেক আড়ম্বরহীন এবং চাকরবাকরের সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছে। গাড়ি, ঘোড়া, আসবাবপত্র সব বিক্রী করে ফেলা হয়েছে। মালী ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাগান জঙ্গল হয়ে উঠল। মতিলাল প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়েছেন। জওহরলালের তখন

কোনো আয়ই ছিল না। যাই হোক্, তিনিও তাঁর খরচপত্র যথাসম্ভব কমিয়ে দিলেন এবং রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে লাগলেন। আইন-ব্যবসায়ে আবার ফিরে যাওয়ার চিন্তা তিনি মনের মধ্যে একেবারেই স্থান দিলেন না। টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু দেশের কাজের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে গেল।

১৯২৩।

দক্ষিণ ভারতের কোকোনদ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হোল। সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী। তখন থেকেই জওহরলাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯২৯ সন পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্ব বহন করেছিলেন। এই সময়েই মতিলাল আনন্দভবনের একাংশ কংগ্রেসকে দান করেন। সেই অংশের নাম রাখা হয় স্বরাজভবন। এই স্বরাজভবনে বসেই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জওহরলাল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই বছরের শরৎকালে জওহরলাল যুক্তপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর দিলেন।

১৯২৪। জানুয়ারির মাঝামাঝি।

অসুস্থতার দরুণ গান্ধীকে জেল থেকে পুণা হাসপাতালে আনা হোল। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হবে। এলাহাবাদে বসে এই সংবাদ শুনে জওহরলাল যারপরনাই বিচলিত হোলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠল। কিছুদিন পরে সংকট কেটে গেল। গান্ধী তখন হাসপাতালে রক্ষী-বেষ্টিত বন্দীরূপে অবস্থান করছেন। পিতার সঙ্গে জওহরলাল পুণা যাত্রা করলেন; উদ্দেশ্য — হাসপাতালে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

গান্ধীকে আর জেলে ফিরে যেতে হয়নি।

তাঁর দণ্ডের বাকী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সরকার তাঁকে

মুক্তি দিলেন। ছ'বছরের মধ্যে মাত্র দু'বছর তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। মুক্তির পর স্বাস্থ্যের খাতিরে গান্ধী এলেন জুহুতে। বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে এটি একটি মনোরম স্থান। মতিলাল ও জওহরলালও সেইসময়ে কিছুদিন জুহুতে অবস্থান করেছিলেন। মতিলাল এসেছিলেন গান্ধীকে স্বরাজ্যদলের অবস্থা বুঝিয়ে তাঁর নিজের মতে তাঁকে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৯২৩-এর নির্বাচনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্বরাজ্যদল নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে, এইসব কথাও তিনি সবিস্তারে বোঝালেন গান্ধীকে। তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মতেই অটল রইলেন।

জওহরলাল এসেছিলেন গান্ধীর ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি জানার ঔৎসুক্য নিয়ে। কিন্তু তাঁর ঔৎসুক্যের নিরসন হোল না।

—মহাত্মাজি, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ?

—কিছুই না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি কাজ করি না।

—কিন্তু দেশের লোক এখন একটা কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করছে।

—দেশের লোকের উচিত ধৈর্যসহকারে জনসেবা করা।

—শুধু জনসেবা ?

—না, সেই সঙ্গে কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজও চালাতে হবে।

– আন্দোলন হবে না ?

—হবে। সংগ্রামশীল কাজের জন্য শুভদিনের অপেক্ষা করতে হবে। আমি চাই চৌরিচৌরার পুনরুক্তি আর না হয়। সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে।

উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা হঠাৎ ভারতের আকাশ-বাতাসকে বিক্ষত করে তুলল। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কোথায় যেন অন্তর্হিত

হোল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট শহরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ দেখা দিল—প্রায় দুশো লোক এই দাঙ্গায় নিহত হয়। বহু সম্পত্তি ধ্বংস হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত ভারত গড়ে তুলবেন—এই ছিল গান্ধীর স্বপ্ন এবং তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের প্রধান কথাই ছিল এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির ভাব। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে জন-সাধারণের ওপর তাঁর প্রভাব এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে বিদেশী শাসকবর্গ সেদিন সত্যিই শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁরাই অন্তরালে থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আনার জন্য বদ্ধপরিকর হোলেন। "Divide and rule". অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা রেখে দেশ শাসনের নীতিটা তখন থেকেই গৃহীত হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয় একটা সামান্য কারণকে উপলক্ষ করে। জওহরলাল লিখেছেন ঃ "কলহের যে নতুন কারণ উপস্থিত হোল তা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক সচরাচর ঘটনা। মসজিদের সামনে হিন্দুরা বাজনা বাজায়, এতে মুসলমানদের আপত্তি। বাজনার গোলমাল মসজিদে প্রার্থনার ব্যাঘাত হয়—এই কথা তাঁরা বললেন। ভারতের প্রত্যেক বড়ো শহরেই কতকগুলি মসজিদ আছে। এখানে পাঁচবার করে উপাসনা হয়। হিন্দুর বিবাহ যাত্রার সময় বাজনা বাজাবার নিয়ম আছে। সন্ধ্যাকালে হিন্দুর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। কাজেই আরতি-নামাজ সমস্যা বড়ো হয়ে উঠল।"

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা শহরবাসীদের মধ্যেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্প্রদায়িক নেতারা সামনে এসে এই তিক্ততাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন। ক্রমে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে এর প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠল। ফলে, ভারতের জাতীয় ঐক্য ও

স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হওয়ার উপক্রম হোল। এমন অবস্থায় কংগ্রেস বিপাকে পড়ল। জাতীয়ভাবের প্রতিনিধি এবং জাতীয় আদর্শের ধারক ও বাহক কংগ্রেস এই উৎকট সাম্প্রদায়িকতার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হোল।

দেশের এই অবস্থা ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন গান্ধী।

তিনি বুঝলেন রাজনৈতিক প্রগতি-বিরোধীরা হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থরক্ষার নামে সরকারের হাতে খেলার পুতুল হয়ে উঠেছেন। তিনি বুঝলেন সরকারের আসল লক্ষ্য কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িকতা উপলক্ষ মাত্র। সমস্যার মীমাংসার জন্য গান্ধী গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তিনি বললেন: "আমার মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সদিচ্ছার উপরেই সমাধান নির্ভর করে। এজন্য আমি মুসলমানদের সকল দাবী মেনে নিতে রাজী আছি।"

জওহরলাল এইবার বুঝলেন মহাত্মার মহত্ত্ব কোথায়।

তিনি মুসলমানদের চিত্তজয় করতে চাইলেন, দর কষাকষির মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। গান্ধীর দূরদর্শিতা ও বাস্তব বোধ দেখে তিনি চমৎকৃত হোলেন। জওহরলালও এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতার জন্যই সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য এর পিছনে শাসক সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট উস্কানি ছিল।"

এই পটভূমিকায় ১৯২৪ সনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য কতকগুলি 'ঐক্য সম্মেলন' আহূত হোল। এর মধ্যে কংগ্রেস থেকে যে সম্মেলনটি আহূত হয়েছিল সেইটিই উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য দিল্লীতে গান্ধীজী যখন একুশ দিন অনশনে ছিলেন সেই সময় এর অধিবেশন হয়। কিন্তু কয়েকটি সাধু ও উত্তম প্রস্তাব গৃহীত হওয়া ছাড়া, মূল সমস্যার কোনো সমাধান হোল না।

১৯২৪-এর দিল্লীর সম্মেলন শেষ হোতে না হোতেই এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধল। নিজের প্রদেশে এই দাঙ্গা দেখে জওহরলাল বেদনাবোধ করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দিল্লী থেকে এলাহাবাদে ফিরে এসে দেখেন হাঙ্গামা শেষ হয়েছে; কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ এবং আদালতের মামলায় অনেকদিন ধরে এর জের চলল। রামলীলা উৎসব নিয়েই এই হাঙ্গামা বেধেছিল। সেই থেকে এলাহাবাদে রামলীলা উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৫।

কংগ্রেসের কাজে তখন ভাঁটা পড়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনার হ্রাস পেয়েছে।

চরকার গুণগুণানি আগের মতো আর নেই; খদ্দরের বিক্রিও কমেছে। জাতীয় পতাকাবাহীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনও তখন থেমে গিয়েছে। গান্ধী এই বছরটা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে অতিবাহিত করলেন। গ্রীষ্মকালে অসুস্থ পিতাকে নিয়ে জওহরলাল এলেন পঞ্জাবের ডালহৌসি পাহাড়ে। ঠিক এই সময়ে একদিন (১৬ই জুন, ১৯২৫) দার্জিলিং থেকে সংবাদ—সংবাদ নয়, দুঃসংবাদ এলো—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মারা গিয়েছেন। সমস্ত জাতি সচকিত হয়ে সেই দারুণ দুঃসংবাদ শুনল। জওহরলাল লিখেছেন—"দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রোগশয্যায় পিতা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।" তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে চিত্তরঞ্জন এক চিঠিতে মতিলালকে লিখেছিলেন: "আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটকাল ঘনিয়ে আসছে। ভগবান জানেন কি হবে।"

এই বছরের শরৎকালে কমলার কঠিন অসুখ করল। কয়েকমাস তিনি লক্ষ্ণৌর হাসপাতালে শয্যাশায়ী রইলেন। সেবার কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হোল। এই সময়টা খুব উদ্বিগ্নচিত্তেই

জওহরলালকে এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ ও কানপুরের মধ্যে ছুটাছুটি করতে হয়েছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন কমলাকে সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার আনসারিও ঐ কথা বললেন।

১৯২৬, মার্চমাস। স্ত্রী ও আটবছরের মেয়ে ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে জওহরলাল য়ুরোপ যাত্রা করলেন ; সঙ্গে গেলেন তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী ও ভগ্নিপতি রণজিৎ পণ্ডিত। তিনিও তখন ভারতের বাইরে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, কারণ তাঁর মন তখন নানা সমস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল—কোনো পথ দেখতে পাচ্ছিলেন না।

৭

তেরো বছর পরে য়ুরোপে এলেন জওহরলাল।

তিনি দেখলেন যুদ্ধে বিদ্রোহে এই কয় বছরে এদেশে কতো পরিবর্তনই না হয়েছে। এইবার তিনি প্রায় দু'বছর য়ুরোপে বাস করেছিলেন। দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তি হোল। বেশির ভাগ সময় তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভায় ও মণ্টানার পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়েছিলেন। ছোট বোন কৃষ্ণাও ভারতবর্ষ থেকে ক্রমে তাঁদের দলে যোগ দিল। কমলা কিছু সুস্থ বোধ করলে জওহরলাল সপরিবারে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে ভ্রমণ করেন। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর সঙ্গে নাভার নির্বাসিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর দেশপ্রেমের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আরো দু'জন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে জার্মানিতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আর অন্যজন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তখন ওদেশে ভারতবর্ষের অনেক বিপ্লবী বাস করতেন এবং তাঁরা য়ুরোপে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য চালাতেন।

এইসব ভারতীয় রাজনৈতিক নির্বাসিতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জওহরলাল তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই বলেছেন: "তাঁদের স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এঁদের অনেকেই দুঃখ, বিঘ্ন ও বাধা জয় করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এঁরা সকলেই ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ

করেছিলেন।" এঁদের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে মিল না থাকলেও জওহরলাল এঁদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ে ওদেশের অনেক মনীষী ব্যক্তির সঙ্গেও জওহরলালের পরিচয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোম্যাঁ রোলাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "তীর্থযাত্রীর মতো রোম্যাঁ রোলাঁর দর্শন লাভ করেছি।" জওহরলাল নিজেই বলেছেন এই কথা। য়ুরোপে থাকার কালেই তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রে স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর সাগ্রহে পাঠ করতেন। য়ুরোপে থাকতে থাকতেই ১৯২৬ সনের শেষভাগে তিনি এক কলঙ্কমলিন কুকীর্তির সংবাদ পেলেন—যে সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ সেদিন ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে উঠেছিল। রোগশয্যাশায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক ধর্মান্ধ মুসলমান নিহত করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির এই শোচনীয় অধোগতি দেখে প্রবাসে জওহরলাল যারপরনাই ব্যথিত হন।

১৯২৭ শেষ হয়ে এলো।

মস্কো থাকার সময় খবরের কাগজে জওহরলাল একদিন সাইমন কমিশন নিয়োগের সংবাদ পাঠ করলেন। ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বিলেতের পার্লামেণ্ট থেকে এই কমিশন গঠিত হয়। জওহরলাল ভারতবর্ষে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হোলেন। সামনেই বড়োদিন—এবার মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য সংকল্প করলেন। মতিলাল তখন য়ুরোপে এসেছেন। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই জওহরলাল সপরিবারে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভারতবর্ষে ফিরেই জওহরলাল কংগ্রেসের কাজে আগের মতোই

আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি এর জেনারেল সেক্রেটারি—কত বড়ো তাঁর দায়িত্ব। য়ুরোপ থেকে তিনি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন যে, মহাযুদ্ধের ফলে সেই পুরাতন পৃথিবী আর নেই। এখন সেখানে নবীন জগৎ দেখা দিয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা সর্বত্রই চলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর। জগতের ঘটনাপ্রবাহ জগতের সামনে এক নতুন আশার বাণী প্রচার করছে। আবার সেইসঙ্গে তিনি এই ধারণাও নিয়ে ফিরলেন যে, পরিবর্তনের অন্তরালে একটা ভাঙনের খেলাও শুরু হয়েছে।

এই পরিবেশে জওহরলালের মনে এই চিন্তা জাগল যে, কংগ্রেসী রাজনীতি শুধু জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কংগ্রেসের বাইরে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যেও নতুন আদর্শ প্রচার করতে হবে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব ও আরো কয়েকটি নতুন ধরণের প্রস্তাব তিনি পেশ করলেন। সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাব রূপে গৃহীত হোল। এমন কি, মিসেস য়্যানি বেশান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই বিদুষী আইরিশ মহিলা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এক সময়ে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর থেকেই স্বাধীনতা প্রস্তাবই কংগ্রেসে মুখ্য হয়ে উঠল এবং পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে এক উদ্বেল ভাবাবেগ সহসা দেশের মধ্যে জেগে উঠল। ডাক্তার আনসারি মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন: "অসহযোগিতা আমাদের ত্যাগ করেনি, আমরাই অসহযোগিতা বর্জন করেছি!" গান্ধীও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনো আলোচনায় যোগ দেন নি। কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি, তবুও এর অধিবেশনে তিনি যোগ

দিলেন না। নেহরু বলেছেন যে, স্বরাজ্য-দলের উদ্ভবের পর থেকে তিনি কংগ্রেসের প্রতি এইরকম অনাসক্তিই দেখিয়ে আসছেন।

তথাপি একথা সত্য যে সব বিষয়ে গান্ধীর পরামর্শ নেওয়া হোত এবং তাঁর অগোচরে কংগ্রেসের কোনো প্রধান কাজই হোত না। জওহরলাল যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, বিশেষ করে স্বাধীনতার প্রস্তাব—গান্ধী অবশ্য সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না। সামনেই সাইমন কমিশন। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ণস্বাধীনতা লাভের পক্ষে দেশ কতদূর প্রস্তুত সে বিষয়ে গান্ধী যতটা বুঝতেন, তরুণ জওহরলাল ঠিক ততটা বুঝতেন না। তাই দেখা যায় ১৯২৮ সনের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখের এক চিঠিতে গান্ধী জওহরলালকে লিখছেন: "প্রিয় জওহর, তুমি বড়ো দ্রুতগতিতে চলেছ। য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে সকলের আগে তোমার উচিত ছিল দেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া; দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ধীরভাবে একটু ভাবনা চিন্তা করা। তুমি মাদ্রাজ কংগ্রেসে যেসব প্রস্তাব তুলেছ এবং যেসব প্রস্তাবের বেশিরভাগই গৃহীত হয়েছে, আমার বিবেচনায় সেগুলি আরো একবছর পরে উত্থাপিত হোলেই ভাল হোত। তুমি এখন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি—এখন তোমার কংগ্রেসের ঐক্যের আদর্শ নিয়ে কাজ করা উচিত আর সাইমন কমিশন বর্জন সফল করার বিষয়েও চিন্তা করা উচিত।"

১৯২৮।

দেশের সর্বত্রই নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্দীপনা।

জনসাধারণের মধ্যেও এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা দেখা গেল।

দু'বছর আগে যে ভারতবর্ষ ছিল নির্জীব ও অবসন্ন, এখন সেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠল সতেজ ও সক্রিয়—এক অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায়

জাগ্রত। শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। সাত-আটবছর আগে স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এরই মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তখন এর সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কৃষকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। যুক্ত-প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে ঘন ঘন কৃষকদের প্রতিবাদ সভা হোতে লাগল। গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধি নিয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কৃষকদের ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা দিল। এই সংঘর্ষই পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহ-রূপে দেখা দেয়।

বারদৌলি তালুকের শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে খাজনা বেড়ে যায়। জমির আয় বাড়ল না, অথচ খাজনা বাড়ল দেখে প্রজারা করল প্রতিবাদ; কিন্তু সরকার প্রতিবাদ শুনলেন না। কর বন্ধ আন্দোলন করবে বলে চাষীরা নোটিস দিল। গান্ধীর অন্যতম সহকর্মী, কংগ্রেসের 'লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই বিখ্যাত আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন। কংগ্রেস এসে দাঁড়াল চাষীদের পাশে। পুলিস খাজনা আদায় করতে না পেরে চাষীদের গরু, লাঙল ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যেতে লাগল। চাষীরা তবু মাথা নত করে না। এলো পাঠান পুলিস; তাদের অত্যাচারে সারা তালুকে বয়ে গেল রক্তস্রোত। এমন সময়ে গুর্জরের সিংহ সর্দার প্যাটেল হুংকার দিলেন—দমননীতি বন্ধ না করলে দেশময় আগুন জ্বলে উঠবে। শুরু হয় কংগ্রেসী আদর্শে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ। ফল হোল আশ্চর্য—সরকার জমির খাজনা কমাতে বাধ্য হোলেন। বারদৌলিতে কৃষকের জয় ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করল।

শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে খুব আন্দোলন।

দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুব-সমিতি এবং প্রায়ই নানাস্থানে যুব-সম্মেলন হোত। এই সম্মেলনগুলিতে সর্বত্রই তখনকার অর্থনৈতিক

ও সামাজিক সমস্যা আলোচিত হোত। দেশের যুবশক্তি বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানাল—"বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই।"

তবে ১৯২৮-এর প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা দুইটি। একটি—সাইমন কমিশন বয়কট; দ্বিতীয়টি—সর্বদল সম্মিলনী (All-Parties Conference) এবং দুই দুইটি ঘটনার আবর্তে পড়ে ভারতের অবরুদ্ধ শক্তি এক নতুন উন্মাদনায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাইমন কমিশনের কথাই আগে বলি। ভারতবাসীরা স্বরাজ পাওয়ার উপযুক্ত কিনা তা তদন্ত করার জন্য এই বছরে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে একটি দল পাঠালেন। এই দলের সভাপতি ছিলেন স্যর জন সাইমন। ১৯২৬-২৭ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি যেমন ছিল নিস্তরঙ্গ, ১৯২৮-এ তেমনি তা হয়ে উঠল উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮।

সাইমন কমিশন এসে পৌঁছলেন বোম্বাইতে।

আমরা স্বাধীনতালাভের যোগ্য কিনা, এই বিচার করবে বিদেশী ইংরেজ—এই কারণেই ভারতবাসী কংগ্রেসের নির্দেশে সাইমন কমিশন বর্জন করল। ভারতব্যাপী প্রতিপালিত হয় হরতাল। কাজ-কারবার সব অচল। দোকানপাট বন্ধ। মাদ্রাজে গুলি চলল। কলিকাতায় পুলিস ও ছাত্রদের মধ্যে হোল সংঘর্ষ। দিল্লী শহরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোল—"সাইমন কমিশন ফিরে যাও।" ঘটনা চরমে উঠল পঞ্জাবে। কমিশন লাহোরে পৌঁছলে এক বিরাট জনতা তাঁদের লক্ষ্য করে জানায় তীব্র বিক্ষোভ। পঞ্জাব-কেশরী লজপৎ রায় ও বৃদ্ধ মদনমোহন মালব্য এই বিক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব করেন। পুলিস জনতার ওপর লাঠি চালায়। জনৈক ইংরেজ পুলিসের বেটনের আঘাত লাগে লজপৎ রায়ের বুকে। মারাত্মক সেই আঘাতের ফলেই সতর দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্ষুব্ধ হোয়ে ওঠে সারা ভারত। বিক্ষুব্ধ হয়

ভারতের বিশাল জনসংঘ। বিহার, যুক্তপ্রদেশ—সর্বত্রই কমিশনকে বয়কট করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শহরে সাইমন কমিশন বয়কটের সংগঠনের দায়িত্ব ছিল জওহরলালের ওপর। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেনঃ "লজপৎ রায়ের লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর পর, সাইমন কমিশন যেখানেই যেতে লাগলেন, বিরূপ অভ্যর্থনা অধিকতর প্রবল হোল। লক্ষ্ণৌতে কমিশন আসার আগে থেকেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি প্রস্তুত হোতে লাগল। আমি লক্ষ্ণৌতে গিয়ে এসব ব্যাপারে যোগ দিলাম। কংগ্রেসের পতাকাবাহী ষোলজন স্বেচ্ছাসেবকের একটি মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিসের লাঠি ও বেটনের আঘাত পেলাম। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করলাম। সারা শরীর বিষিয়ে উঠল। শরীরের নানাস্থানে আঘাত ও প্রহারের চিহ্ন দেখে পিতা খুব মর্মাহত হোলেন।···এই আঘাতের মধ্যেও অন্তরে এক আশ্চর্য শক্তি অনুভব করলাম। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—এর পরিণাম কি? এর পরিণতি কোথায়?"

অবশেষে তদন্তকার্যে ব্যর্থ হোয়ে সাইমন কমিশন ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। উদ্ধত ব্রিটিশ রাজশক্তির মহিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই বছরের দ্বিতীয় ঘটনা লক্ষ্ণৌতে সর্বদল সম্মেলন।

সম্মেলনে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। মতিলাল নেহরু এই সময়ে য়ুরোপ থেকে ফিরে উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দিলেন। গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। এইখানেই একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় একটি কমিটির ওপর। সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সমস্যাটাই একটি বড়ো বিঘ্নরূপে সম্মেলনের সামনে দেখা দিয়েছিল। শাসনতন্ত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি চিন্তা

করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মতিলাল। তাই কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহা 'নেহরু কমিটি' নামে খ্যাতিলাভ করেছে। কমিটির সিদ্ধান্ত 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। কমিটির অন্যতম সদস্য স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু রিপোর্টের অংশ বিশেষ রচনা করেছিলেন।

সর্বদল সম্মেলনে নেহরু রিপোর্ট আলোচিত হয়। জওহরলাল লিখেছেন: "আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এক দোটানায় পড়লাম। আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা করতে চাই না, কিন্তু অন্যদিকে স্বাধীনতার আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন।"

জওহরলাল একমনে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর নিজের কার্যপ্রণালী তখন নানাদিকে নিয়োজিত হয়েছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তিনি সমাজজীবনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেইগুলির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার দিকে ঝোঁক দিলেন। এই বছরে (১৯২৮) জওহরলাল পঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশের চারিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তখন থেকেই দেশের যৌবনশক্তির প্রতীকরূপে তিনি যুবকদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে স্থান লাভ করছিলেন। গান্ধী-যুগে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তখন থেকেই জাগ্রত যৌবনশক্তির প্রতীক হিসেবে দুটি নাম ভারতের জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

জওহরলাল নেহরু।

সুভাষচন্দ্র বসু।

ভারতের অগণিত চিত্তে তখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র—এই দুজনেও তাঁদের স্ব স্ব স্থান লাভ করেছেন।

নবোদিত সূর্যের মতোই এই দুই দৃপ্ত তরুণের সংগ্রামী মনোভাব ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন বেগ ও আবেগের সঞ্চার করছিল। অগ্রগতির অগ্নিশিখারূপেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র তখন থেকেই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যে কথা বলছিলাম। পল্লী অঞ্চলে ও কারখানার শ্রমিকদের কাছে জওহরলাল প্রচার করেন স্বাধীনতার বাণী—আহ্বান করেন তাদের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য। সর্বত্রই তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতার কথা বলতেন। প্রচার করতেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। পরিচিত কথার পুনরুক্তি নয়—নতুন দিনের নতুন বাণীই এই সৈনিকের বলিষ্ঠ কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোত।

এই পরিবেশে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এবার সভাপতি নির্বাচিত হোলেন মতিলাল নেহরু আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দেশের কাজে মৃত্যুর পূর্বে দেশবন্ধু জাতিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার দুইজন দেশপ্রেমিককে—একজন যতীন্দ্রমোহন, অপরজন সুভাষচন্দ্র। এবারকার কংগ্রেসে যে বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী সুভাষচন্দ্র গঠন করেছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার হয়ে আছে। এই বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ভাবীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজীকে সেদিন এর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

কলিকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব নতুন করে উঠল; সর্বদলীয় সম্মেলনের পর থেকেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়েছিল। জওহরলাল স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে কিছুতেই আপোষ করতে চাইলেন না। কলিকাতায় এসে মতিলাল জানিয়ে দিলেন, কংগ্রেস যদি তাঁর মতানুযায়ী কাজ না করে—অর্থাৎ সর্বদল সম্মেলনের রিপোর্টের উপর

রচিত প্রস্তাব যদি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহোলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন না। তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হোল ; জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র একদিকে, আর অন্যদিকে প্রবীণের দল নিয়মতান্ত্রিক পথ আঁকড়ে রইলেন।

জওহরলাল নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : "অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হোল যে, কংগ্রেস সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দেবেন যে, এক বছরের মধ্যে ঐ শাসনতন্ত্র গৃহীত না হোলে কংগ্রেস আবার স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে। সরকারকে দেওয়া হোল সৌজন্যপূর্ণ এক চরমপত্র। আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলাম।"

৮

১৯২৯।

জওহরলালের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও।

এই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুরু।

লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল এই বছর।

সভাপতি—জওহরলাল নেহরু।

আগের বছর কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীর আপোষমূলক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। গান্ধী বলেছিলেন, "মুখে শুধু 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারণ করলেই স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। এর জন্য দরকার ত্যাগ, দরকার সংগ্রাম আর দরকার নির্যাতন স্বীকার।"

"দরকার হোলে আমরাও তাই করব।" উত্তরে বলেছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। যতই লাহোর কংগ্রেসের দিন এগিয়ে আসতে থাকে, ততই কংগ্রেস দলে নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য তৎপরতা দেখা দেয়। দশটি প্রাদেশিক কমিটি গান্ধীকে সভাপতি করার পক্ষে ছিল, আর পাঁচটি কমিটি ভোট দিল সর্দার প্যাটেলের পক্ষে, মাত্র তিনটি কমিটি সুপারিশ করলেন নেহরুর নাম। গান্ধী কিছুতেই রাজী হোলেন না। এমন কি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুরোধ সত্ত্বেও নয়। বরং তিনিই প্রস্তাব করলেন তরুণ জওহরলালের নাম। তাঁর প্রস্তাবে সকলেই সায় দিলেন। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল যে সভাপতির

দায়িত্বজনক পদে নির্বাচিত হোলে জওহরলাল হয়ত একটু ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করবেন—স্বাধীনতার জন্য অত অস্থির হবেন না। সেইসঙ্গে গান্ধীর মনের মধ্যে এমন আশা দেখা দিয়েছিল যদি এবার স্বাধীনতার দাবী ওঠে, তাহোলে এই দাবীকে সফল করার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য নেতা আর কেউ নেই।

যথাসময়ে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হোলেন।

এই সংবাদে সবচেয়ে গর্ববোধ করলেন মতিলাল। গর্ব এবং সুখ। আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে পিতার হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ—এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায়নি। মতিলাল যখন পুত্রের হাতে সভাপতির গুরু দায়িত্ব তুলে দেন তখন নিশ্চয়ই তিনি পুত্রকে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারও দান করেছিলেন। এই ঘটনার একবছর পরে যখন পিতা ও পুত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তখন, কথিত আছে, তাঁর এক সহকর্মীকে মতিলাল বলেছিলেন—"আমার সবচেয়ে গর্ব করার বিষয় এই যে আমি জওহরলালের পিতা।"

নির্বাচনের কয়েকদিন আগের কথা।

জওহরলালকে সভাপতির জন্য সুপারিশ করার আগে গান্ধী তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন।

"তুমি কি মনে করো এই দায়িত্ববহনের ক্ষমতা তোমার আছে?"

"যদি আমার ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, আমি পশ্চাৎপদ হবনা।"

"সাবাস। এই তো তোমার যোগ্য কথা।"

পরে গান্ধী জাতির নেতারূপে জওহরলালকে সুপারিশ করে লিখেছিলেনঃ "চিন্তার দিক দিয়ে জওহরলাল নিঃসন্দেহে একজন চরমপন্থী। বর্তমান পরিবেশ অপেক্ষা তিনি অনেকখানি অগ্রগামী। কিন্তু তিনি নম্র প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর বাস্তববোধ আছে। তিনি সত্যবাদী এবং বিশুদ্ধ-চরিত্র। তাঁর হাতে জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ।"

জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হোলেন।

ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রমাদ গণল। হোয়াইট হল আর রাজধানী দিল্লীতে সরকারী মহলে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। লর্ড আরুইন তখন ভারতের বড়োলাট। তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের ঠিক দু'মাস আগে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। তাঁর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে লণ্ডনে একটি গোল-টেবিল বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। নেহরু কমিটির রিপোর্টেও কংগ্রেস থেকে এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথাই বলা হয়েছিল ; লর্ড আরুইন সম্ভবত সেই কথা স্মরণ করে এই ঘোষণা করে থাকবেন।

ডিসেম্বর ২৩, ১৯২৯।

দিল্লীতে গান্ধী, মতিলাল, সাপ্রু, জিন্না প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আরুইন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে অভ্যর্থনা জানালেন। গান্ধী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন যে, বড়োলাট তাঁদের এই আশ্বাস দিতে পারেন কিনা যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ঠিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ভিত্তিতে হবে। আরুইন কিন্তু সেরকম কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না। নেতারা ফিরে এলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে দিল্লীর ওপর নয়—লাহোরের ওপর। রাবি নদীর তীরে কংগ্রেসের বিরাট সভা। কংগ্রেস শিবিরে তুমুল উত্তেজনা। দর্শক ও প্রতিনিধি মিলিয়ে ত্রিশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে এত জনসমাগম এই প্রথম। একটি বিরাট শাদা ঘোড়ায় চড়ে নির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল চলেছেন মণ্ডপের দিকে। তাঁর পিছনে

এক বিশাল শোভাযাত্রা। মতিলাল ও স্বরূপরাণী দুই চোখ মেলে সেই দৃশ্য দেখলেন। পুত্রগর্বে তাঁদের মন ভরে ওঠে। আনন্দে আত্মহারা হোয়ে স্বরূপরাণী পুত্রের উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান—কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

কংগ্রেস এতকাল আবেদন-নিবেদনের পথে চলে শুধু দাবী করেছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম নিয়ে এলেন পূর্ণস্বাধীনতার দাবী। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হোল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হাতে দেওয়া হোল আন্দোলন চালাবার ভার। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে যখন নতুন বছর এলো, কংগ্রেসের নতুন সভাপতি উত্তোলন করলেন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা।

লাহোর কংগ্রেসে সীমান্ত প্রদেশ থেকে অনেক লোক যোগ দিয়েছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে এলেন। তাঁদের নবীন ও সতেজ মনে কংগ্রেস সভাপতির উদ্দীপনাময়ী ভাষণ রেখাপাত করল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐক্যবোধ ও উৎসাহ নিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

ঘটনার স্রোত দ্রুত বয়ে চলল।

স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না। তাই স্বরাজ্যদলপতি মতিলালের নির্দেশে কংগ্রেসী সদস্যগণ আইন-সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সংগ্রাম আসন্ন। তার আগে দেশবাসীর মনোভাব জানা দরকার। সভাপতির নির্দেশে ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস নির্দিষ্ট হোল। আজো আমরা প্রতি বৎসর এই দিনটি পালন করে থাকি। ঠিক হোল, ঐদিন দেশের সর্বত্র পূর্ণ স্বরাজ্য সংকল্প গৃহীত হবে।

১৯৩০। ভারতবাসীর জীবনে এক অপূর্ব বৎসর।

গান্ধীজী তাঁর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনলেন।

১৯৩০। ২৬শে জানুয়ারি।

আগ্রহ ও উদ্দীপনায় থম্ থম্ করছে সারা ভারতবর্ষ।

জাতি সাড়া দিয়েছে অকুণ্ঠচিত্তে। ভারতের আকাশে যেন ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমক খেলে যাচ্ছে। সেদিনের কথা স্মরণ করে জওহরলাল নিজেই বলেছেন: "সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করছে—সে এক মহান দৃশ্য। সেখানে কোনো বক্তৃতা নেই, নেই অনুরোধ উপরোধ।"

দেশের এই উত্তেজিত মনোভাব গভীরভাবে অনুধাবন করলেন গান্ধী। তিনি বুঝলেন, এবার কাজ করার সময় উপস্থিত। বুঝলেন, দেশ আগের চেয়ে অনেক বেশি সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, জাতির মনে স্বাধীনতালাভের আশঙ্কা আগের চেয়ে আরো প্রবল হোয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন।

৩১শে জানুয়ারি। গান্ধী ঘোষণা করলেন তাঁর এগার-দফা দাবী এবং বললেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই দাবীগুলি পূর্ণ করেন, তা'হোলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবেন।

জওহরলাল কিন্তু গান্ধীর এই পাঁচ-মিশালী দাবীর সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না। নেতার এই আচরণে তিনি বিস্মিত হোলেন। লবণকর উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে আইন অমান্যের মিল কোথায়?—মনে মনে চিন্তা করলেন তিনি। গান্ধীর সব কাজই অদ্ভুত—ধাঁধার এবং বাধার সৃষ্টি করে। তবু ধৈর্য ধরতে হয়, কারণ আগামী আন্দোলনের ভার যে তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

২রা মার্চ। গান্ধী বড়োলাটকে এক চিঠিতে জানালেন যে, লবণ

আইনকে তিনি বে-আইনী বলে মনে করেন। তিনি এই আইন ভঙ্গ করতে চান। লবণ আইনটা কি? এদেশ থেকে বিলেতে যে পরিমাণ জিনিস রপ্তানী হোত, তার চেয়ে অনেক কম জিনিস আসত। কম জিনিস আসত বলে জাহাজ প্রায়ই খালি থাকত। ফলে জাহাজ চলাচলে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হোত। সেই খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য লবণ আনা হোত। বিলিতি নুন সস্তায় বিক্রী করার জন্য দেশী লবণের ওপর ট্যাক্স বসানো হোল। তাতে দেশী নুনের দাম বেড়ে গেল। ফলে সস্তা বিলিতি নুন চলতে লাগল বাজারে। এরই বিরুদ্ধে গান্ধীজী অভিযান শুরু করলেন।

১২ই মার্চ।

শুরু হয় স্মরণীয় ডাণ্ডী অভিযান।

গান্ধীর আশ্রম তখন সবরমতীতে। সেখান থেকে দুশো মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে ডাণ্ডী। সেইখানে পায়ে হেঁটে চললেন গান্ধী। সঙ্গে ৭৯ জন সহকর্মী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেন চলল সমগ্র ভারত। আশ্রম থেকে যাত্রা করলেন ১২ই মার্চ। পথে তিনি বক্তৃতা করতে করতে চললেন। চব্বিশ দিন পায়ে হেঁটে ৫ই এপ্রিল গান্ধী এসে পৌঁছলেন ডাণ্ডীতে। পরের দিন সকালে প্রভাতী প্রার্থনার পর তিনি নুন তৈরি করলেন সমুদ্রের জল দিয়ে। ডাণ্ডীর সমুদ্রোপকূলে আইন অমান্য করলেন মহাত্মা গান্ধী। সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক প্রাণস্পন্দন দেখা দিল জাতির মধ্যে। সারাদেশে আবার দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য। বাংলায় কাঁথিতে লবণ তৈরি করতে গিয়ে কর্মী ও নেতারা আইন অমান্য করলেন। যারা তা করল না, তারা বিলিতি কাপড়ের দোকানে এবং মদগাঁজার দোকানে দোকানে পিকেটিং করতে লাগল। সমস্ত দেশে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতো সকলে সর্বস্ব পণ করে কাজ করতে লাগল।

উদ্বেলিত হোয়ে উঠল সারা ভারতবর্ষ।

জারি হোল কঠোর অর্ডিন্যান্স—সংবাদপত্রের কণ্ঠ হয় নিরুদ্ধ প্রেস আইনে। চলে বেপরোয়া লাঠি, বেটন ও গুলি। জেল, জরিমানা, মাল-ক্রোক চলল অব্যাহত গতিতে। পেশোয়ার থেকে কলিকাতা—সর্বত্র চলল আইন অমান্য আন্দোলন। ৫ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হোলেন গান্ধীজী। নেহরু লিখেছেন: "এপ্রিল এলো। গান্ধীজী ক্রমশঃ সমুদ্রের কাছাকাছি হচ্ছেন; আমরা লবণ আইন ভেঙে আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করছি। এই কয়মাস আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করছিল। কমলা ও কৃষ্ণা পুরুষের পোষাক পরে এদের দলে যোগ দিয়েছিল। খবর এলো ডাণ্ডীর বেলাভূমিতে গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন। তিন-চারদিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় ঐরূপ করার নির্দেশ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে বলা হোল।"

বাঁধ ভেঙে এলো বন্যার জল।

দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আইন অমান্য আন্দোলনের বাণী।

জনসাধারণের উৎসাহের অন্ত রইল না।

১৪ই এপ্রিল জওহরলাল গ্রেপ্তার হোলেন।

কারাগারের মধ্যে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তিনি ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হোলেন।

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হোলেন মতিলাল।

জেলে বসে জওহরলাল যখন সংবাদ পেলেন যে, তাঁর বৃদ্ধা মা আর বোনেরা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করেছেন তখন তিনি বিচলিত হোলেন। খবর পেলেন কমলাও তাই করেছেন। তিনি শুধু পিকেটিং করে ক্ষান্ত হননি—একেবারে আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর

শক্তি ও দৃঢ়তা দেখে স্বামী বিস্মিত হোলেন। কিছুদিন বাদেই পিতা ও পুত্রে কারাগারে মিলিত হোলেন। তখন তাঁর কাছে সব কথা শুনলেন জওহরলাল। তাঁরা তখন ছিলেন নৈনী জেলে। সাত বছর পরে এই কারাবাস।

১৯৩০ সন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর হিসেবে চিহ্নিত হোয়ে রইল। জাতিকে অনুপ্রাণিত করার আশ্চর্য শক্তি দেখে জওহরলাল বিস্মিত হোলেন। জেলে বসে তিনি বাইরের যতটুকু সংবাদ পেতেন তার থেকেই জওহরলাল জানতে পারলেন যে, নেতার অভাবে আন্দোলনে ভাঁটা পড়া দূরে থাক—ইহা তীব্রভাবেই চলছে। এই আন্দোলনে ভারতের পুরনারী দলে দলে অংশ গ্রহণ করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বাইরের ঘটনাবলীর চিন্তা এবং জেলের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ—এই নিয়েই নৈনী জেলে জওহরলালের দিন কাটতে লাগল।

১১ই অক্টোবর জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

বাইরে তখন একদিকে চলেছে তীব্র সংঘর্ষ, অন্যদিকে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের আপোষের চেষ্টা। এই চেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন সপ্রু ও জয়াকর। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এঁদের 'শান্তি-দূত' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সদ্যকারামুক্ত জওহরলাল উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর অসুস্থ পিতার জন্য। মতিলাল তখন মুসৌরিতে চিকিৎসাধীনে ছিলেন। কারামুক্তির পর দেড় দিন এলাহাবাদে থেকে জওহরলাল কমলাকে নিয়ে মুসৌরি যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি পিতার সঙ্গে তিন দিন অবস্থান করলেন। "তাঁকে অনেকটা ভাল বোধ হোল, এ যাত্রায় তিনি সেরে উঠলেন ভেবে আনন্দিত হোলাম। এই তিনদিনই পিতার সহিত আমার সর্বশেষ ও একত্র অবস্থান। তারপর যখন চরম রোগ তাঁকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন একবার দেখেছিলাম মাত্র।"

সাতদিন বাদে জওহরলাল এলাহাবাদে আবার গ্রেফ্‌তার হোলেন।

রোগশয্যায় শায়িত মতিলাল পুত্রবধূ কমলার কাছে যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি আহত হোলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি একদিন জেলে গিয়ে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

—আপনি এখন কেমন আছেন?

—আর থুতুর সঙ্গে রক্ত পড়ে না। খুব ভাল আছি।

—বাইরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিলে কেমন হয়।

—কিন্তু যাই কি করে? আন্দোলন তো এখনো চলছে আর লোকে উপদেশের জন্য আমার কাছে আসে।

১৯৩১। ১লা জানুয়ারি।

নববর্ষের প্রথম দিনে জেলে বসেই নেহরু সংবাদ পেলেন কমলা গ্রেফ্‌তার হয়েছেন। এই সংবাদে তিনি খুশি হোলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর শরীরের অবস্থা স্মরণ করে একটু শঙ্কিতও হোলেন। জেলখানায় তাঁর খুবই কষ্ট হবে। কমলাকে যখন গ্রেফ্‌তার করা হয় তখন একজন রিপোর্টার তাঁর কাছে একটি বাণী চায়। মুহূর্তের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে জওহর-পত্নী বললেনঃ "আমি আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি বলে আমি গর্ববোধ করছি। আমি আশা করি, সকলে জাতীয় পতাকা উঁচে তুলে রাখবে।"

চিকিৎসা ও বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মতিলাল তখন সপরিবারে কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। পুত্রবধূর গ্রেফ্‌তারের সংবাদে বিচলিত মতিলাল কয়েকদিন পরেই এলাহাবাদে ফিরলেন। অসুস্থ পিতা নৈনী জেলে এলেন একদিন বন্দী পুত্রকে দেখবার জন্য। রোগ-জর্জর মতিলালকে দেখে পুত্র যারপরনাই শঙ্কিত হোলেন—বুঝলেন সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। জওহরলাল দেখলেন, চিরদিন যাঁকে

তিনি অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতীক বলে মনে করে এসেছেন, আজ সেই পিতার চেহারা রোগশীর্ণ ; উজ্জ্বল মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। মুখখানা ফুলে গেছে। পুত্র উদ্বিগ্ন হন। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে নানা অমঙ্গলের আভাস। জেলে পুত্র ও জামাতা রণজিৎকে দেখে মতিলাল খুশি হোলেন।

২৬শে জানুয়ারি। জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

এরোডা জেল থেকে গান্ধীও ঐ একই দিনে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরের দিনই বোম্বাই শহরে এক বিশাল জনসভায় গান্ধীজী অভ্যর্থিত হোলেন। তারপর জওহরলালের বিশেষ অনুরোধে অসুস্থ মতিলালকে দেখার জন্য তিনি সোজা চলে এলেন এলাহাবাদে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সকল সদস্যই একে একে মুক্তিলাভ করলেন। এলাহাবাদের স্বরাজভবনেই কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসল। আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অনুকূলেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সদ্য কারামুক্ত বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে জওহরলাল মিলিত হোলেন।

দিন যায়।

পিতার স্বাস্থ্যের অবনতিতে পুত্রের মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়ে।

মতিলাল এখন বেশি কথা বলতে পারেন না। তাঁর পিতার এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে জওহরলাল লিখেছেন : "তিনি মরণাহত বৃদ্ধ সিংহের মতোন বসে আছেন, তাঁর দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, তথাপি সেই সিংহগ্রীব পুরুষ আপন গরিমায় অটল। একদিন তিনি গান্ধীজীকে বললেন, "মহাত্মাজি, আমি শীঘ্রই চলে যাচ্ছি, আমি স্বরাজ দেখে গেলাম না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি স্বরাজ লাভ করবেন।"

তখন মতিলালের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন তিনজন বিখ্যাত চিকিৎসক— বিধানচন্দ্র রায়, আনসারী ও জীবরাজ মেহতা। এক্স-রে

শরীরে দেওয়া দরকার, ডাক্তাররা বললেন। এলাহাবাদে এক্স-রে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জওহরলাল মোটর গাড়ি করে পিতাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে এলেন। আনন্দভবন থেকে মতিলালের সেই শেষযাত্রা। লক্ষ্ণৌ আসার দু'দিন পরেই, ৬ই ফেব্রুয়ারি সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের জীবনদীপ নির্বাপিত হোল। পরের দিন সন্ধ্যায় এলাহাবাদের ত্রিবেণীসংগমে পিতার শেষকৃত্য করে জওহরলাল যখন নীরবে আনন্দভবনে ফিরলেন তখন "সেই শ্রীহীন শূন্যতার ঊর্ধ্বে আকাশে তারকারাজি ফুটে উঠেছে।" কিন্তু শোকাহত পুত্রের মনের আকাশ তখন ছেয়ে গেছে নৈরাশ্যের অন্ধকারে। মতিলাল নেহরু নেই—এ যেন তিনি চিন্তাই করতে পারছেন না। আনন্দভবনের সবই আছে, সবাই আছে, নেই শুধু একটি মানুষ! আবার পরমুহূর্তে, নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে, জওহরলাল মানবজীবনের এই পরিণতিকে প্রশান্ত-চিত্তে স্বীকার করে নেন।

৯

মতিলালের যেদিন মৃত্যু হয়, সেইদিন ঠিক সেইসময়ে গোল-টেবিল বৈঠকের একদল ভারতীয় প্রতিনিধি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও ডাক্তার জয়াকর প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দ। এই প্রসঙ্গে নেহরু লিখেছেন: "এইকালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় চলছিল। আমরা একটু ঘৃণামিশ্রিত কৌতুকের সহিত সেই সকল নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও ভঙ্গী দেখছিলাম। ঐ সকল বক্তৃতা, বড়ো বড়ো কথা, সুগম্ভীর আলোচনা যেমন কৃত্রিম, তেমনই নিষ্ফল। দেশের মধ্যে যখন অগ্নি-পরীক্ষা চলছে, অগণিত নরনারী প্রশংসার সঙ্গে কাজ করছেন, সেই সময় আমাদেরই কয়েকজন স্বদেশবাসী এই সংগ্রামের কথা ভুলে গিয়ে বিপক্ষে যোগ দিলেন।"

কিন্তু কংগ্রেস-বর্জিত এই প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যাঁরা যোগদান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা খালি হাতে ফিরলেন। কার্যত এই বৈঠক নিষ্ফল হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন ম্যাকডোনাল্ড। সেই সময় তিনি এক বক্তৃতায় পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন থেকে বিরত হোতে অনুরোধ করেন। রোগশয্যায় শায়িত মতিলাল সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব পাঠ করে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন: "যে পর্যন্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই আপোষ করবেন না।"

মতিলালের মৃত্যুর পর গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েক-

জন সদস্য তখন এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। আনন্দভবনেই কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে গোলটেবিল বৈঠকে কতদূর কি হয়েছে, তাই আলোচনা হোল। এই আলোচনা সভায় সপ্রু ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রস্তাব করলেন, গান্ধীজী বড়োলাটের কাছে চিঠি লিখে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন এবং খোলাখুলিভাবে সব বিষয় আলোচনা করুন। মডারেটদের এই আপোষমূলক মনোভাব জওহরলালের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যাইহোক গান্ধী রাজী হোলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি লর্ড আরুইনকে মহাত্মা একখানি চিঠি পাঠালেন। বড়োলাট গান্ধীর প্রস্তাবে সম্মত হোলেন। তারযোগে এই বার্তা এলাহাবাদে পৌঁছয়। গান্ধী দিল্লী যাত্রা করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা ছু'টার সময় লাটভবনে এই ঐতিহাসিক গান্ধী-আরুইন সাক্ষাৎকার আরম্ভ হয়। কয়েকদিন বাদেই নেহরু প্রমুখ কার্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্যকে গান্ধীজী দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। আইন অমান্য আন্দোলন তখনো চলছিল। এই পটভূমিকায় গান্ধী-আরুইন আলোচনা প্রায় তিন সপ্তাহকাল চলে।

সরকারের সঙ্গে আপোষ!

জওহরলালের সংগ্রামী মন কিছুতেই এতে সায় দেয় না।

দিল্লীতে একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে তিনি গান্ধীর কাছে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন।

"তোমার সন্দেহ ও সংকোচ ঠিক। কিন্তু একজন সত্যাগ্রহী হিসাবে যাদের সঙ্গে আমার মতভেদ আছে সেই বিরোধীদলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করা উচিত।"

গান্ধীর এই উত্তর জওহরলালের মনে কিন্তু দাগ কাটল না। বললেন: "আপনার সুবিবেচনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু

যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আজ সংগ্রামে লিপ্ত তাদের সঙ্গে আপোষ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।”

গান্ধী ঈষৎ হাসলেন।

“তোমার ধৈর্য ধরা উচিত। দেখিনা কি হয়।”

জওহরলাল আর তর্ক করেন না। বড়োলাট ও গান্ধীর মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। সারাদেশ সাগ্রহে সেই আলোচনার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ছয় দফা দাবী জানিয়েছিলেন গান্ধী বড়োলাটের কাছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান ; অবিলম্বে দমননীতির প্রত্যাহার ; বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ; রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত সকল সরকারী কর্মচারীর পুনর্নিয়োগ ; লবণ তৈরি করার স্বাধীনতা দান ; মদের দোকান ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং এবং পুলিসি অত্যাচারের জন্য তদন্তের ব্যবস্থা—এই ছিল ছয় দফা দাবী।

লর্ড আরুইন শান্তিকামী ছিলেন।

গান্ধীর মতোন তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

সহসা গান্ধী-আরুইন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকদিন ধরে বড়োলাট গান্ধীজীকে ডেকে পাঠালেন না।

সকলেই মনে করল, কথাবার্তা ভেঙে গেল।

তারপর ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৪ঠা মার্চের মধ্যরাত্রে বড়োলাটের বাড়ি থেকে গান্ধী ফিরলেন চুক্তির খসড়া নিয়ে। নেহরু খসড়াখানি দেখলেন। দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হোলেন। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ভীড় করে আসে। আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হোল—আমাদের নেতা স্বয়ং কথা দিয়ে এসেছেন। এখন কি কর্তব্য? গান্ধীজীকে পরিত্যাগ করব? তাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হব? ঘোষণা করব আমাদের অনৈক্য? মন তাঁর ফিরে যায় অতীতের সেই দিনগুলিতে যখন অহিংস অসহযোগের ঘূর্ণাবর্তে তিনি জীবন ভাসিয়ে

দিয়েছিলেন। আবার পরমুহূর্তে তাঁর মনে হোল, হয়তো ভালই হয়েছে। এই আপোষের কথাবার্তা ভেঙে গেলে দেশে নৈরাশ্যের সঞ্চার হোত। অতঃপর তিনি এই গান্ধী-আরুইন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কংগ্রেসও দিল। তবে সেইসঙ্গে সদস্যরা এইকথাও গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন যে, এই সন্ধির দ্বারা তাঁরা কোনো মূলনীতি প্রত্যাহার করলেন না। অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঠিকই রইল।

পরের দিন। সকাল বেলা।

নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে চলেছেন গুরু ও শিষ্য।

পথে যেতে যেতে গান্ধী সস্নেহে বলেন—"জওহর, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি মূলনীতি কিছুই বিসর্জন দিইনি। ভারতবর্ষের খাতিরেই আমি বড়োলাটের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।"

জওহরলালের মনের সংশয় তবু ঘোচে না। তিনি বললেন: "আজ চৌদ্দ বছর আপনাকে আমি জানি। তবু মনে হয় আপনার স্বরূপ বুঝতে পারিনি। এইটাই তো আমার কাছে ভয়ের কথা।"

"ঠিক বলেছ। আমিও আমাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।"

সেইদিন মধ্যাহ্নকালে লাটভবনে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোল। দুইপক্ষই আনন্দিত। বড়োলাট চা দিয়ে গান্ধীর স্বাস্থ্য কামনা করলেন। আর গান্ধী বড়োলাটের স্বাস্থ্য কামনা করলেন লবণসহ নেবুর জল দিয়ে।

এই ঘটনার সময়েই বিলেতে সংরক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চিল গান্ধীকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' এই আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

গান্ধী-আরুইন চুক্তিমতো কংগ্রেস এবার গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা

করতে সম্মত হোল। ইহাই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক। এই বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করলেন একা গান্ধী।

কিন্তু, দিল্লী-চুক্তির অব্যবহিত পরেই লর্ড আরুইন ভারত ত্যাগ করলেন এবং লর্ড উইলিংডন নতুন বড়োলাট হয়ে এলেন। নতুন বড়োলাট যেমন কড়া, তেমনি শক্তলোক। তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র আপোষ-প্রবণতা নেই। কিছুদিন বাদে নানাস্থান থেকে কংগ্রেসের নেতারা খবর পেতে লাগলেন যে, বহুস্থানেই সরকারী কর্মচারীরা দিল্লী চুক্তি ভঙ্গ করেছে। সীমান্তে তখন আব্দুল গফুর খানের নেতৃত্বে 'লাল কুর্তাদল'-এর আবির্ভাব হয়েছে। এই অঞ্চলে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচারে আব্দুল গফুর খান ও তাঁর এই স্বেচ্ছাবাহিনীর অবদান কম ছিল না সেদিন। জওহরলাল সীমান্ত পরিদর্শনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থকাম হোলেন।

সন্ধিকালের সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে চলল।

জওহরলাল গভর্ণমেণ্টকে জানালেন যে সরকারী কর্মচারীরা অনেক জায়গায় চুক্তিভঙ্গ করেছে। গভর্ণমেণ্ট তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ধি-বিরোধী কাজের পাল্টা অভিযোগ করতে লাগলেন। ফলে, কংগ্রেস ও সরকারের সম্পর্কের কোনো উন্নতি হোল না। ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়তে থাকে। গভর্ণমেণ্ট যে ক্রমশঃ কঠিন হচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা তা বুঝতে পারেন। নতুন বড়োলাটের সঙ্গে গান্ধী ও নেহরু দুজনে একবার সিমলায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সরকারের অনমনীয় মনোভাব বিবেচনা করে গান্ধীর মন চাইছিল না যে তিনি ভারত ছেড়ে বিলেতে গিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিলেত গেলেন। আগস্ট মাসের শেষে একদিন প্রভাতে বোম্বাই বন্দরে জওহরলাল গান্ধীকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গোলটেবিল

বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লণ্ডনে চলে গেলেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সকলেই ভারতে রয়ে গেলেন। এই সংকটের সময় তাঁদের থাকার প্রয়োজনও ছিল। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে লণ্ডনের এই গোলটেবিল বৈঠকের ওপর। কতখানি গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ভারতকে দেওয়া হবে—এইটাই ছিল মূল প্রশ্ন। আলোচনার বিষয় অন্য কিছু ছিল না। তাই কংগ্রেস তার নেতাকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করাই যথেষ্ট বিবেচনা করল। গান্ধীর সঙ্গে গেলেন সরোজিনী নাইডু; তাঁর ওপর গান্ধীর দেখাশুনা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ভারত ত্যাগের পূর্বে দেশবাসীকে গান্ধী জানিয়ে গেলেন: “আমি একমাত্র ভগবান ভরসা করেই লণ্ডন যাচ্ছি।”

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

গান্ধী এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে।

প্রতি সপ্তাহে পত্রযোগে নেহরু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত বিবরণ তিনি তাঁর চিঠিতে গান্ধীকে লিখে পাঠাতে লাগলেন। সেইসব চিঠি পড়ে তিনি বুঝলেন যে দেশের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। তাঁর ভারতে ফেরার কথা নভেম্বরে, কিন্তু বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর তিনি বুঝলেন যে ফিরতে হয়ত আরো একমাস দেরী হোতে পারে। তাই একপত্রে তিনি জওহরলালকে আরো কিছুকাল ধৈর্য ধরে থাকতে বললেন। কিন্তু অবস্থা ক্রমে এমন গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে যে তখন নেহরুও তাঁর সতীর্থগণ একযোগে গান্ধীর কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন।

নির্দেশ এলো—“তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।”

বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্লাই ভারী হোয়ে ওঠে। তখন ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোর। বৈঠক বসবার আগে তিনি একদিন

আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তো দূরের কথা, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তিনি এখনি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। তাছাড়া ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কোনো প্রতিশ্রুতিই দিতে পারে না।

ভারতসচিবের মুখে এই কথা শুনে গান্ধী স্তম্ভিত।

কথায় বলে, ছায়া পূর্বগামিনী। বৈঠকের ফলাফল শেষ পর্যন্ত যে কী দাঁড়াবে সেটা তিনি তখনি অনুমান করলেন। তবু যখন এসেছেন তখন শেষ চেষ্টা করতে ছাড়বেন না। তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছার ওপরে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খুব বড়ো করে তোলা হোল, যেন ঐটাই ভারতের প্রধান সমস্যা। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বেছে বেছে এমন কতকগুলি ব্যক্তিকে এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত করেছিলেন যাঁরা উগ্র সাম্প্রদায়িক। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যাটাকেই প্রধান প্রশ্নে পরিণত করা। তথাপি গান্ধী বৈঠকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—"যদি ভারতের মুসলমানগণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করে, তাহোলে তিনি তাদের দাবী স্বীকার করতে রাজী আছেন।"

শেষ পর্যন্ত বৈঠক ব্যর্থ হোল।

জওহরলাল নিজেই লিখেছেন: "এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য বা সার্থকতার কোনো প্রশ্ন ছিল না। এতে আশা করার সামান্যই ছিল, তথাপি অন্যদিক দিয়ে এই বৈঠক একটু আলাদা ধরণের। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি ছিল কিন্তু প্রথম বৈঠকের প্রতি ভারতের বা অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু ১৯৩১

সনের ঘটনা আলাদা, কেননা কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং কোটি কোটি লোকের নেতা গান্ধীজী বৈঠকে যোগদান করলেন।”

বৈঠক যাতে ব্যর্থ হয় সেইভাবেই ইহা গঠিত হয়েছিল।

১লা ডিসেম্বর বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হোল।

গান্ধী এবার স্বদেশে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হোলেন।

তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন।

ভারতে বসে নেহরু যখন এই সংবাদ পেলেন তখন এরজন্য তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় বা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। কারণ ইহাই ছিল প্রত্যাশিত। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীর ওপর কি হোতে পারে, নেহরু সেটা অনুমান করলেন। অবমানিত মনুষ্যত্বের বেদনা প্রত্যেকেই বোধ করবে—বোধ করবে নৈরাশ্যের ক্ষোভ। বোধ করবে আশাভঙ্গের বেদনা। তাঁর মনে হোল আইন অমান্য আন্দোলনের দ্যুতি যেন স্তিমিত হয়ে এলো।

২৮শে ডিসেম্বর।

বোম্বাই শহরে পদার্পণ করা মাত্র গান্ধী সংবাদ পেলেন যে, নেহরু ও আব্দুল গফুর খান ধৃত হয়েছেন এবং বিনা বিচারে গ্রেফ্‌তার ও আটক রাখার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে।

“আমাদের খ্রীষ্টান বড়োলাটের কাছ থেকে বড়োদিনের উপহার।” এই মন্তব্য সেদিন গান্ধী করেছিলেন।

যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা তখন চরমে উঠেছিল। তারা পরামর্শের জন্য কংগ্রেসের প্রতি তাকাল। জওহরলাল তখন এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করেন। তিনি কংগ্রেসের পতাকাতলে কৃষকদের দলে দলে যোগ দিতে বলেন। তখন থেকেই সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওঁর ওপর নিবদ্ধ হয়েছিল। গান্ধী ফিরছেন ; তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বোম্বাই যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন জওহরলাল। ঠিক সেই সময় এটোয়াতে প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়ার কথা। সরকার

হুকুমজারি করলেন, সম্মেলনে কৃষক সমস্যা আলোচনা করা যাবে না। যদি হয় তাহোলে তাঁরা সম্মেলন বন্ধ করে দেবেন। তখন জওহরলাল দোটানায় পড়লেন। যে বিষয় নিয়ে সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত সেই কৃষক সমস্যাই আলোচনা করা সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করলেন, সম্মেলন আহ্বান করে তাতে ঐ বিষয়ে আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আত্মপ্রতারণা মাত্র। আবার সেইসঙ্গে তিনি চিন্তা করলেন—সরকারী নির্দেশের বিরোধিতা করলে সংঘর্ষ আসন্ন। গান্ধী এসে না পৌঁছান পর্যন্ত কোনো সংঘর্ষ হয়, এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সব চিন্তার পর এটোয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়।

২৬শে ডিসেম্বর শেরোয়ানীকে সঙ্গে নিয়ে নেহরু বোম্বাই যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হোলেন। সরকার কিন্তু আগে থেকেই তাঁদের দুজনের ওপর এই মর্মে হুকুমনামা জারী করে রেখেছিলেন যে, তাঁরা এলাহাবাদ শহর পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তথাপি তাঁরা যাত্রা করলেন এবং পথিমধ্যেই একটি ছোট স্টেশনে বোম্বাই মেল থামিয়ে পুলিস তাঁদের কামরায় গ্রেফ্‌তার করার জন্য প্রবেশ করল। জওহরলাল দেখলেন, বাইরে রেললাইনের পাশেই পুলিসের কালো গাড়ি অপেক্ষা করছে। নেহরু ও তাঁর সঙ্গী সেই রুদ্ধদ্বার গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি তাঁদের নিয়ে নৈনী জেলে ছুটল।

নেহরু আবার কারাগারে এলেন।

১০

শুধু যে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল তা মনে করলে ভুল হবে। বাংলাদেশ চিরকাল বিপ্লবের পীঠস্থান। সেই স্বদেশী যুগের সময় থেকে এখানে সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দেয় এবং তখন এর নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তারপর গান্ধী-যুগে বাংলায় দেশবন্ধু যখন নেতা তখন থেকে আবার অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি চলতে থাকে বাংলার বিপ্লবী যুবকদের হিংসাত্মক আন্দোলন। সরকার বাংলার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রীতিমত ভয় পেয়েছিলেন এবং তাঁরা কঠোর হাতে ইহা দমনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে বাংলার বীর বিপ্লবী ছেলেরা দেশময় যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল তা সেদিন ভারতের আন্দোলনকে অনেকখানি রাঙিয়ে দিয়েছিল।

১৯২৮ সন থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করে। সাইমন কমিশনের সময় লাজপৎ রায়ের ওপর পুলিসের জুলুমের প্রতিশোধ নিলো পঞ্জাবের বিপ্লবীরা। লাহোরের পুলিস কমিশনার স্যাণ্ডার্সকে গুলি করে মারা হোল। আবার একদিন রাজধানী দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদে পড়ল বোমা। ধরা পড়েন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। সারা ভারতব্যাপী এক বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হোল। এই ষড়যন্ত্র 'লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে খ্যাত। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসীর হুকুম হোল। রাজবন্দীদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে যতীন দাস জেলের মধ্যে ছেষট্টি দিন অনশন করে কারাগারে

মারা যান। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই বিপ্লবীর অনশনে মৃত্যু বরণ অভিনব। গান্ধী পর্যন্ত যতীন দাসের অনশন ও তার পরিণতি দেখে এই যুবকের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেছিলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আগে ভারতের বীর বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। অহিংস সৈনিকেরা যখন ইংরেজের শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন বিপ্লবীরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। পাশাপাশি তাঁরাও আন্দোলন চালিয়েছেন। তাঁদের অসীম সাহসের সংঘবদ্ধ প্রকাশ দেখা গেল এইবার চট্টগ্রামে। অনেকদিন আগে থেকেই এখানকার বিপ্লবীরা তাদের নেতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীর ঘাঁটিতে এইবার আঘাত হানবার আয়োজন করলেন। ১৯৩০। এপ্রিল মাস। রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবী ফৌজরা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে এসে পৌঁছল সরকারী অস্ত্রাগারে। অস্ত্রাগার বা আর্মারি (Armory) ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক। সেই প্রতীককেই আঘাত করা হোল। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর সংবাদ সারা ভারতে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। বিলেতের পার্লামেণ্টে পর্যন্ত এই সংবাদ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এরপরেই ঢাকায় মেডিকেল কলেজে বিপ্লবীরা গুলি চালাল। নিহত হোলেন মিঃ লোম্যান নামে এক ইংরেজ অফিসার। কিছুদিন পরেই তারা হানা দিল গোলদীঘির রাইটার্স বিল্ডিং-এ। দিনে-দুপুরে সরকারের এমন সুরক্ষিত ঘাঁটিতে কেউ যে আঘাত হানতে পারে, তা কেউ ভাবতেই পারেনি। এই আক্রমণের সংবাদ শুধু যে বিস্ময় জাগিয়েছিল তা নয়, ভীষণ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করেছিল। বাংলার তিনটি দুর্ধর্ষ তরুণ বিপ্লবীর নাম জড়িয়ে আছে এই বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে। তাঁরা হোলেন বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত

(বাদল) আর দীনেশ গুপ্ত। বিনয়, বাদল ও দীনেশ একসঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় উঠে আক্রমণ চালান। নিহত হন কারাগারসমূহের বড়োকর্তা লেঃ কর্ণেল সিম্পসন। বিনয় ও বাদল নিজেরাই বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, আর সরকার দীনেশকে বহু চেষ্টা করে বাঁচিয়ে তুলে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তারপর একদিন প্রত্যূষে আলিপুর জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল দেশময়।

ডালহৌসি স্কোয়ারে একদিন পুলিস কমিশনার টেগার্টের ওপর বোমা পড়ল। লাহোরে লাটসাহেবের ওপর বোমা পড়ল। বোম্বাইতে লাটসাহেবের ওপর বোমা পড়ল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে এক সমাবর্তন সভায় বাংলার দুই বিপ্লবী তরুণী পিস্তল চালালেন লাট সাহেবের ওপর। হিজলী জেলে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের ওপর মিলিটারী পুলিস গুলি চালায়, ফলে দুজন রাজবন্দী মারা যান। এই ঘটনায় দেশে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। ময়দানে এক বিরাট সভায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। সেই স্মরণীয় সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন তাঁর কণ্ঠে সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ যে ধিক্কারবাণী ঝংকৃত হয়েছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

জওহরলাল বাংলার এই বিপ্লববাদ পছন্দ করতেন না। তিনি গান্ধী-শিষ্য এবং অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত। বোমা-বন্দুকে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তবু তিনি বাংলার জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে তাঁদের ত্যাগ স্বীকারের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিরত হননি। চট্টগ্রাম ও হিজলীর ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে তিনি কয়েকদিনের জন্যে কলিকাতায় এসেছিলেন। এইসময়ে তিনি বাংলার কয়েকজন

বিপ্লবী নেতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "সন্ত্রাসবাদের প্রশ্ন আলোচনা করে আমি দেখিয়েছিলাম যে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ইহা নিষ্ফল ও অনিষ্টকর। সন্ত্রাসবাদীরা ভীরু বা কাপুরুষ নন। দেশপ্রেমই যে তাঁদের এই দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে ব্যক্তিগত-ভাবে আমি সন্ত্রাসবাদী হিংসা-নীতির সমর্থন করি না।"

গান্ধী যখন খালি হাতে গোলটেবিল বৈঠক থেকে ভারতে ফিরলেন তখন কংগ্রেসী আন্দোলন ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে ভারতের অবস্থা অনেকটা বারুদের স্তূপের মতোন। নতুন বড়োলাট উইলিংডন দৃঢ়হস্তে হিংসাবাদী ও অহিংসাবাদী সকল আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হোলেন। বাংলায় অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে, এ সংবাদ লণ্ডনে থাকতেই গান্ধী পেয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি খুব বিচলিত বোধ করেছিলেন। বোম্বাইয়ে নেমে বড়োদিনের উপহার স্বরূপ যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার সংবাদ লাভ করলেন এবং শুনলেন, ঐ দুই প্রদেশের তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা গ্রেফ্‌তার হয়েছেন।

এই উত্তপ্ত পটভূমিকায় গান্ধী ফিরলেন লণ্ডন থেকে।

ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে, শান্তির আর কোনো আশা নেই। তবু শেষবার চেষ্টা করবার জন্য তিনি বড়োলাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী হোলেন। নয়াদিল্লী থেকে তাঁকে জানাল হোল যে, কতকগুলি শর্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হোতে পারে। শর্ত ছিল যে অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা চলবে না। গান্ধী বললেন, এইসব অর্ডিন্যান্স আইন-সংগত সন্ত্রাসবাদ আর এই নিয়েই সমস্ত দেশ উত্তেজিত। কাজেই উহা যদি আলোচনার অন্তর্ভূ্ত না হয় তবে আলোচনা করার আছে কি?

বোঝা গেল সরকার কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন। তখন কংগ্রেসের পক্ষে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড়া পথ রইল না। তবু আপোষের পথ খোলা রেখে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হোল। জেলে যাওয়ার আগে গান্ধী দেশবাসীকে কাজের নির্দেশ দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হোলেন। তিনি আর একবার চেষ্টা করলেন বড়োলাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য। "বিনা শর্তে দেখা করতে চাই"—এই ছিল তাঁর শেষ তারবার্তা।

উত্তরে গভর্ণমেণ্ট গান্ধীকে বন্দী করলেন।

কংগ্রেস সভাপতিকে বন্দী করলেন।

নৈনী জেলে বসে জওহরলাল শুনলেন এই সংবাদ।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩২। ঐদিন গ্রেফ্‌তারের সময় গান্ধী তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে এই বাণী দিলেন: "ঈশ্বরের অসীম কৃপা। সত্য ও অহিংসার পথ থেকে কেউ যেন এতটুকু বিচলিত না হয়; কেউ যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে। তোমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বরাজ অর্জন করতে হবে।"

ঐ তারিখেই নৈনী জেলের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের জরুরী ক্ষমতামূলক অর্ডিন্যান্স অনুসারে জওহরলাল ও শেরওয়ানীর বিচার হোল। শেরওয়ানীর ছমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দেড়শো টাকা জরিমানা হোল; জওহরলালের হোল দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশো টাকা জরিমানা—জরিমানা না দিলে আরো ছ'মাস। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করলেন এবং ১০ই জানুয়ারির মধ্যে সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেস নেতারা ধৃত হোলেন। সমগ্র দেশে জারী করা হোল অর্ডিন্যান্স আইন। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা তখন এই আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। চার মাসের মধ্যে আশীহাজার লোক কারারুদ্ধ হোল। নেতারা সবাই জেলে, কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা সমানে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে

লাগলেন। কিছুদিন পরে জওহরলালের মা, বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণার একবছর করে কারাদণ্ড হোল। পনর ষোল বছরের মেয়েরা হাজারে হাজারে জেলে যেতে লাগল।

এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হোল।

পুলিস বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, লাঠি চালায়। তবু জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপনে ভারতবাসীর কী আগ্রহ, কী উদ্দীপনা! জাতীয় সপ্তাহের শোভাযাত্রা বেরুল এলাহাবাদে। সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন স্বরূপরাণী। পুলিসের লাঠি পড়ল তাঁর মাথায়। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। আঘাত গুরুতর হোল। তবু সেই অবস্থায় তাঁকে একখানি চেয়ারের ওপর বসিয়ে শোভাযাত্রা চলল। পুলিস লাঠি চার্জ করে সেই শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লাঠির আঘাতে স্বরূপরাণী চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। তাঁর কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি মূর্ছা গেলেন। এলাহাবাদের রাজপথে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিসের হাতে দেখল নারীর লাঞ্ছনা। একজন পুলিস অফিসার তাঁর মোটর গাড়ি করে মূর্ছিতা স্বরূপরাণীকে নিয়ে এলেন আনন্দভবনে। জেলের মধ্যে বসে মায়ের এই লাঞ্ছনার সংবাদে জওহরলাল যারপরনাই বিচলিত হোলেন।

কমলা তখন বোম্বাইতে রোগশয্যায় শায়িতা।

তিনি এবারকার আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না বলে দুঃখ করতে লাগলেন।

কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে।

কার্যকরী সমিতি থেকে প্রাদেশিক, জেলা, তালুক, সর্ববিধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হোল। কৃষকসভা, প্রজা-সমিতি, যুব-সমিতি, ছাত্র-সংঘ, স্বদেশী ভাণ্ডার কিছুই বাদ গেল না। একে

একে সকল প্রতিষ্ঠানই বে-আইনী ঘোষিত হোল। জওহরলাল লিখেছেন, "ভারতে কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হয়ে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরব ঘোষণাই করল।"

জেলে বসে বন্দী জওহরলাল এসব ঘটনা কিছুই জানতে পারলেন না। নানাভাবে এখন তাঁর সময় কাটে। চরকায় সূতা কাটা, লেখাপড়া, আলোচনা এইসব নিয়ে তিনি থাকতেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে সবসময় এক চিন্তা—জেলখানার বাইরে এখন কি হচ্ছে? "সময় সময় আমরা প্রত্যাশায় অধীর হোতাম, কখনো বা কোনো ভুল-ত্রুটির জন্য রাগ করতাম। কখনো বা খুব অনাসক্ত হোয়ে পড়তাম। আমি বিস্মিত হোয়ে আগামী দিনের কথা ভাবতাম—ভাবতাম এই সংঘর্ষ-সংঘাত, এই কল-কোলাহল, এই দুঃসাহসী উৎসাহ, এই নিষ্ঠুর দমননীতি—এর পরিণাম কি? আমরা কোথায় চলেছি? বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই অস্পষ্টতার আবরণে আবৃত।"

এইভাবে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে জওহরলালের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। কখনো কখনো তিনি কল্পনা করতেন যে, আবার তিনি একদিন মুক্ত হবেন এবং আবার নতুন সংগ্রামের মধ্যে দীপ্যমান হয়ে উঠবে তাঁর জীবন।

নৈনী জেল থেকে জওহরলাল বেরিলি জেলে স্থানান্তরিত হোলেন।

এইখানে একদিন স্বরূপরাণী ছেলেকে দেখতে এলেন। তখনো তাঁর মাথায় পটি বাঁধা। ললাটদেশের এই লাঞ্ছনাকে তিনি গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন—মনে করতেন মুক্তিসংগ্রামে এইতো সম্মানের চিহ্ন। ক্রমে জেলে জওহরলালের স্বাস্থ্য খারাপ হোতে থাকে। মাসের পর মাস সমানভাবে জ্বর। জ্বরের মাত্রা দিনের পর

দিন বেড়েই চলেছে। গ্রীষ্মকালে বেরিলিতে ভীষণ গরম। কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেরাদুনের স্বাস্থ্যপ্রদ ও শীতল জায়গায় স্থানান্তরিত করলেন। গোবিন্দবল্লভ পন্থকেও তখন এখানে আনা হোল। নৈনী জেলে ছ'সপ্তাহ, বেরিলি জেলে চার মাস কাটিয়ে নেহরু এলেন দেরাদুন জেলে। কারাদণ্ডের অবশিষ্ট সময় তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন।

জেলে বসেই জওহরলাল সংবাদ পেলেন যে, বাইরের আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এলো, তবু ইহা কোনো মতে চলতে লাগল। কিন্তু গতিপথে ইহা আর পরিপূর্ণ গণ-আন্দোলন রইল না। গভর্ণমেণ্টের তীব্র দমননীতির ফলেই আন্দোলন থেমে গেল। এই সময় (১৯৩২, সেপ্টেম্বর) হরিজন সমস্যা নিয়ে গান্ধী এই প্রথমবার অনশনব্রত গ্রহণ করেন। এই অনশন-সংবাদে ভারতের জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

যখন ভারতের বহু নরনারী অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তখন কারান্তরালে বসে জওহরলাল সংবাদ পেলেন যে, লণ্ডনে বাছা বাছা ব্যক্তিরা মিলে ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যস্ত আছেন। ১৯৩২ সনে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয় এবং অনেক রকম কমিটির ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্যকে ঐসব কমিটির সদস্য করা হোল। সরকারী খরচে এক বিরাট জনতা লণ্ডনে গেল। জওহরলাল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "ভারতে গণ-আন্দোলন দেখে ভীত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে বিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে সমবেত হবেন। এতে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু যখন মাতৃভূমি জীবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, তখন কোনো ভারতীয়ের এই শ্রেণীর ব্যবহার দেখলে আমাদের জাতীয়বোধ আহত হয়।"

জেলে বসেই জওহরলাল খবর পেলেন যে, কারাগারে শ্রেণী বিভাগ

প্রহসনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ কয়েদীদের চেয়েও কঠোর ও দুঃখপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। জেলে বেত্রদণ্ড আরম্ভ হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট অপরাধে পাঁচশো জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের ঘানি, যাঁতা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হয়েছে। যারা পীড়ন ও অপমানে ক্ষুব্ধ হোত, সেইসব বালক ও যুবকদের ভাগ্যেই এই শ্রেণীর কঠিন পরিশ্রম জুটত। শৃঙ্খল, নির্জন কারাবাস ও বেত্রদণ্ড —গর্বের সঙ্গে আমাদের কর্মীরা ইহা ভোগ করছে। নারীরাও কারাগারে কঠোর ব্যবহার পাচ্ছেন। জওহরলাল নিজেই লিখেছেন ঃ "দু'বছর আগে ১৯৩০ সনের সঙ্গে তুলনায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩-এ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে অধিকতর মন্দ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।"

এইসব বেদনাদায়ক চিন্তার মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হোল। "কখনো বা মাস শেষ হোতে চাইত না, মনে হোত, সময়ের গতি নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্তি-বিকৃত হোয়ে উঠত, সকলের ওপর সব কিছুর ওপর রাগ হোত ; নিজের ওপরও বিরক্ত হোয়ে উঠতাম।" আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তখন দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। শুধু চিঠির প্রতীক্ষায় থাকতে হোত বন্দীদের। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হোয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে লাগল।

এইবার গান্ধীর অনশনের কথা বলি।

১৯৩২। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

নেহরুর বৈচিত্র্যহীন কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী সহসা এক বজ্রাঘাতে বিপর্যস্ত হোয়ে গেল। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে

ম্যাকডোনাল্ড ভারতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। হিন্দুসমাজের বুক থেকে অনুন্নত শ্রেণীদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে, গান্ধী ইহা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি জেলেই এর প্রতিবাদে আমরণ অনশন করবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

আমরণ অনশন !

নানাবিধ চিন্তায় জওহরলালের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হোয়ে ওঠে।

গান্ধীজীর কাজের পরিণাম চিন্তা করে তাঁর হৃদয় দমে গেল। তবে কি তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না ? গান্ধীর অনশনের সংবাদে সমস্ত হিন্দুসমাজ যেন যাদুমন্ত্রে জেগে উঠল। মনে হোল অস্পৃশ্যতার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। জেলে বসেই জওহরলাল দেশব্যাপী এই বিরাট আলোড়নের সংবাদ পেলেন। "আমি ভাবতে লাগলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি কি আশ্চর্য যাদুকর। কি নিপুণভাবে সূত্র আকর্ষণ করে তিনি জনগণচিত্ত অভিভূত করছেন।"

দেরাদুন জেলে এইসময়ে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই নেহরুর কাছে অনশনক্লিষ্ট গান্ধীর একখানি 'তার' পৌঁছল। অনেকদিন বাদে বাপুর কাছ থেকে এই 'তার' পেয়ে তিনি সুখী হোলেন। তারে গান্ধী তাঁর অনশন সম্পর্কে জওহরলালের মতামত চেয়ে পাঠালেন। তারেই জবাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জওহরলাল জবাব দিলেন : "আপনার উপবাসের সংকল্পের কথা শুনে আমি মর্মাহত ও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। এখন আমার মন অনেকটা শান্ত। নির্যাতিত পদদলিত শ্রেণীর জন্য কোনো স্বার্থত্যাগই বড়ো নয়। আপনাকে আমি আর কি উপদেশ দেব। প্রণাম নেবেন।'

যাইহোক, এই উত্তেজনার অবসান হোল। পুণায় সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একখানা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তা স্বীকার করে নিলেন ও সেইমত বাঁটোয়ারার পরিবর্তন

করলেন। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। তাঁর উপবাসভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ পুণায় গিয়েছিলেন। পুণাচুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জেল থেকেই গান্ধী আরম্ভ করলেন হরিজন আন্দোলন। জওহরলালের বিবেচনায় এই আন্দোলন ঠিক হয় নাই, কারণ ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্ষতি হোল এবং দেশের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে চলে গেল। অনেক কংগ্রেসকর্মী হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলেন। গান্ধী এইসময় 'হরিজন' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তখন কারামুক্ত হয়েছেন।

দেশে হরিজন আন্দোলন চলতে লাগল।

সেইসঙ্গে অস্পৃশ্যরা যাতে হিন্দুর দেব-মন্দিরে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারে সে চেষ্টাও করা হোল। মন্দির-প্রবেশ বিল উঠল ব্যবস্থা-পরিষদে। বিল যাতে পাস হয় সেজন্য কংগ্রেসের নেতারা, এমন কি গান্ধী পর্যন্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। জেলে বসে জওহরলাল এইসব সংবাদ পেতে লাগলেন, কিন্তু এসব নিয়ে তিনি খুব মাথা ঘামালেন না। তবে হরিজন আন্দোলনের ওপর তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। ইহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু কংগ্রেস মানেই তখন গান্ধীজী। তিনি যা বলবেন তাই হবে। ১৯৩৩-এর মে মাসে তিনি ছয় সপ্তাহের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন।

ছয় সপ্তাহ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।

তার কিছু আগেই একদিন দেরাদুন জেলে জওহরলাল সংবাদ পেলেন যে গান্ধীজী একটি ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠকেই তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন একেবারে স্থগিত রেখে তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের নির্দেশ দিলেন। ঠিক এই সময় দেশের শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব সমন্বিত 'শ্বেতপত্র' (White Papar) প্রকাশিত হোল। এই শ্বেতপত্র সম্পর্কে

জওহরলাল লিখেছেন: "ইহা এক অপূর্ব দলিল—পড়তে গেলেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। তিনটি গোলটেবিল বৈঠক, অসংখ্য কমিটি ও পরামর্শসভা, তিন বছর ধরে আলোচনার পর এই ফল লাভ হোল। নানাবিধ রক্ষাকবচের বেড়ীলাগানো এক অদ্ভুত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সরকার ভারতবাসীকে দিতে উদ্যত হোলেন। শাসক-সম্প্রদায়ের সৃজনী-প্রতিভার এমন অদ্ভুত বিকাশ কখনো এত প্রত্যক্ষ হয় নি।"

১৯৩৩। ৩০শে আগস্ট।

জওহরলালের দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান হোল।

তাঁর কারামুক্তির ঠিক একমাস আগে রাঁচীতে অন্তরীণ আবদ্ধ অবস্থায় জে. এম. সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলা দেশের তিনিই ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী তাই পরম বেদনা বোধ করল। সেনগুপ্তের মৃত্যুতে নেহরুও যারপরনাই ব্যথিত হয়েছিলেন। সেনগুপ্ত চলে গেলেন। রাজবন্দী সুভাষচন্দ্র তখন কয়েক বছর কারাদণ্ডের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন; সরকার তাঁকে চিকিৎসার জন্য য়ুরোপ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বাংলা তখন একরকম নেতাশূন্য। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু পূর্বেই জওহরলাল কারামুক্ত হন, কারণ হাসপাতালে তাঁর মা স্বরূপরাণী তখন সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন।

কারামুক্তির পরেই তিনি লক্ষ্ণৌতে মায়ের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হোলেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তাঁর এই সময়কার মনের ভাব বর্ণনা করে জওহরলাল লিখেছেন: "দীর্ঘকাল পরে জেলের বাইরে এসে আমি অনুভব করলাম, আমার চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে আমার যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলাম, কিন্তু

রাজনৈতিক কাজকর্মে মনের মধ্যে কোনো আগ্রহই বোধ করলাম না।”

ভারত তখন নিস্তব্ধ। সর্বত্র ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই। জনসাধারণ সন্ত্রস্ত।

দেশে অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ। সরকার কঠোর হস্তে সবই সংযত ও দমন করে ফেলেছেন।

বাইরে থেকে দেখতে ভারতের অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হোলেও, জওহরলাল অনুভব করলেন, এই নিস্তব্ধতা অশুভ সম্ভাবনায় পূর্ণ। কারামুক্তির পর দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি যা দেখলেন, তাতে উৎসাহিত হওয়ার কিছু ছিল না। তাঁর বহু সহকর্মী তখনো জেলে, নতুন নতুন গ্রেফ্‌তারও চলছিল।

জওহরলাল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খুব ব্যগ্র হোলেন। দু’বছরের বেশি হোল তাঁর সঙ্গে নেহরুর সাক্ষাৎ হয় নি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহকর্মীদের সঙ্গেও সাক্ষাতের জন্য তিনি অধীর হোলেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও, পৃথিবীর অবস্থা, বিশেষ করে য়ুরোপের অবস্থা আলোচনা করার জন্য তিনি ব্যস্ত হোলেন। মায়ের শরীর একটু সুস্থ হোলেই জওহরলাল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পুণা যাত্রা করলেন।

১১

একুশ দিন অনশনের ফলে গান্ধী খুব দুর্বল হয়ে পড়েন।

ফলে, তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়।

সেইজন্য তখন তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছিলেন।

দু'বছর আগে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে বোম্বাই বন্দরে গান্ধীজীর সঙ্গে জওহরলালের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল। আজ দু'বছর পরে তাই বাপুজীকে দেখে তিনি খুব সুখী হলেন। দুজনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হোল। দুজনের মধ্যে অবিশ্বাসের কোনো প্রাচীর ছিল না—যা ছিল তা হোল অস্পষ্ট সন্দেহের মাকড়সার জাল মাত্র। বিচিত্র চরিত্রের এই মানুষটিকে সম্যকরূপে বুঝে ওঠা কঠিন। সময় সময় জওহরলালের মনে হোত, মতবাদের দিক দিয়ে গান্ধী প্রাচীনপন্থী এবং আশ্চর্যরূপে পশ্চাদপদ। আবার পরমুহূর্তেই মনে হোত আধুনিক ভারতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক। "তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ, প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। বাইরে তিনি যাই হোন, অন্তরে তিনি বৈপ্লবিক—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর।"

জওহরলালকে দেখেই গান্ধী জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার উৎকণ্ঠা কিসের জন্য ?"

শিষ্য অকপটে তাঁর হৃদয়ের কপাট মেলে ধরেন গুরুর কাছে। সমাজতন্ত্রের পথই ভারতের ভবিষ্যৎ পথ—অর্থনৈতিক উন্নতিই

ইহার কাম্য—এই কথা বললেন জওহরলাল। দেরাছুন জেলে তিনি নতুন করে কার্ল মার্কসের রচনাবলী পাঠ করেছিলেন। তখন থেকেই সমাজতন্ত্রের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

"এখন আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত।" বললেন জওহরলাল।

"এর জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন ?"

"কারণ জনসাধারণ যাতে প্রেরণা বোধ করতে পারে এমন একটি রাজনৈতিক আদর্শেরই এখন প্রয়োজন।"

"ঠিক কথা। স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য—এ কথা তো বলা হয়েছে, তবে তার পুনরুক্তি করে লাভ কি ? এখন যা দরকার তা হোল সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য উপায় নির্ধারণ করা।"

ছুজনের মধ্যে আলোচনা ঘোরালো হয়ে ওঠে।

"কায়েমী স্বার্থের অবসান ভিন্ন জনসাধারণের উন্নতি নেই।"

"ঠিক কথা। তবে সেটা জোর করে করানোর পক্ষপাতী আমি নই—এটা আপনা থেকে আসা দরকার।"

যাই হোক পুণায় গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেহরু বুঝলেন যে জাতির নেতা ভবিষ্যতে কি করবেন সে বিষয়ে তিনি নিজেই এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তিনি কি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করবেন ? আবার জেলে যাবেন এবং হরিজন আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য সুযোগ-সুবিধার দাবী করবেন ? সেই দাবী মঞ্জুর না হোলে আবার আমৃত্যু উপবাস করবেন ? অথবা, তিনি জেলে না গিয়ে হরিজন আন্দোলন পরিচালনা করবেন ? অথবা, তিনি তরুণদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন ?

মনের মধ্যে এইসব চিন্তা নিয়ে নেহরু ফিরে এলেন। ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক সপ্তাহ পুণা ও বোম্বাইতে কাটিয়ে

জওহরলাল লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন। স্বরূপরাণী তখনো হাসপাতালে থেকে ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছিলেন। কমলাও লক্ষ্ণৌ-এ থেকে তাঁর সেবা করছিলেন। তবে তাঁর নিজের শরীরও ভাল ছিল না। এখানে দু'তিন সপ্তাহ অবস্থান করলেন নেহরু—এলাহাবাদের চেয়ে এখানেই তিনি অবসর ও বিশ্রাম অনেক বেশি পেতেন। লক্ষ্ণৌতে তখন তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রত্যহ দু'বার করে হাসপাতালে যাওয়া। অবসর সময়টা তিনি প্রবন্ধ লিখতেন, কারণ তখন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না।

"ভারত কোন্ পথে ?"

এই নাম দিয়ে নেহরু কয়েকটি প্রবন্ধে পৃথিবীর ঘটনাবলীর সঙ্গে ভারতের বর্তমান অবস্থা বিচার করে যা লিখেছিলেন, তা তখন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ঐগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। এই সময়ে ছোট বোন কৃষ্ণার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল। এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিয়ের সময় ঠিক হোল। মা-কে হাসপাতাল থেকে নিয়ে তিনি এলাহাবাদে ফিরলেন। এটা ছিল অসবর্ণ বিবাহ। নেহরু-পরিবারের অবস্থা তখন আগের মতোন ছিল না, তাই বিনা আড়ম্বরেই বিয়ের ব্যাপার সমাধা হয়। আড়ম্বর না করার আরো কারণ ছিল। নেহরু নিজেই বলেছেন : "একে মায়ের অসুখ, তার উপর তখনো কিছু কিছু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চলছিল, আমার বহু সহকর্মী জেলে, কাজেই লোক-দেখানো আড়ম্বরের কথা উঠতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্ব ও স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হোল।" অক্সফোর্ডে শিক্ষিত ব্যারিস্টার জি· পি· হাতীসিং-এর সঙ্গে কৃষ্ণা নেহরুর বিয়ে হয়।

কৃষ্ণার বিয়ের পরেই জওহরলাল কাশী যাত্রা করলেন।

তাঁর পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বছরকাল পীড়িত ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ জেলে থাকার সময় তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, তখন থেকে খুব ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্য লাভ করতে থাকেন। নেহরু যখন কাশীতে অবস্থান করছিলেন তখন একটি হিন্দী-সাহিত্য সমিতি তাঁকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। সমিতির সদস্যগণের সঙ্গে তিনি সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করেন। এইখানেই তিনি সেদিন বলেছিলেন: "মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য রাজদরবারী রীতিতে সাহিত্য রচনা ত্যাগ করে হিন্দী লেখকগণ যেন দৃঢ়তার সঙ্গে সকলে বুঝতে পারে এমন ভাষায় জনসাধারণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন। জনসাধারণের সঙ্গে সংস্পর্শে ভাষা জীবন্ত ও অকৃত্রিম হয়ে উঠবে, লেখকগণও জনসাধারণের ভাবাবেগ থেকে শক্তিলাভ করবেন এবং আরো উন্নততর রচনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন।"

এই সভাতেই জওহরলাল সেদিন বাংলাভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছিলেন: "আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা আধুনিক বাংলা ভাষা অধিক অগ্রসর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী প্রতিভা হিন্দীর তুলনায় অনেক বেশি।"

কাশীতে থাকার সময়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একদিন নেহরুকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করল। তিনি আনন্দের সঙ্গে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই অনুপম কীর্তি। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় নেহরু বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতায় তিনি তীব্র ভাষায় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেন। তাঁর এই বক্তৃতার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দুমহাসভার নেতারা তাঁকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমস্যাটির আলোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বহুল প্রচার লাভ করে। কিন্তু

কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোনো পক্ষ থেকেই কোনো জবাব এলো না। তাঁর এই বিখ্যাত প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই ছিল যে, "সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁরা সকল রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির বিরোধী।" ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন যে প্রয়োজন—এই কথাও তিনি তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করে লিখেছিলেন যে, মিলনের সার্থকতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনৈক্যের কারণগুলি আগে বুঝতে হবে।"

জওহরলালের এই চিন্তা সেদিন স্বাধীনতাবাদী ভারতীয় জনসাধারণের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল। কি দেশনেতারূপে, কি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে জওহরলাল আজীবন এই উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

১৯৩৩ শেষ হোয়ে ১৯৩৪ এলো।

নববর্ষের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস।

কিন্তু স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করায় বাধা ছিল, কারণ তখনো পর্যন্ত কংগ্রেস একটি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয়ে আছে। এমন অবস্থায় ঐ দিবসটি পালন করা মানেই ব্যাপকভাবে ধর-পাকড়। জওহরলাল এই সময় কিছু দিনের জন্য কলিকাতা যাওয়ার চিন্তা করছিলেন; উদ্দেশ্য পুরাতন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা আর কমলার চিকিৎসকগণের সঙ্গে পরামর্শ করা।

এই নতুন বছরের প্রধান ঘটনা—ভূমিকম্প।

জওহরলাল লিখেছেন : "১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারি বিকেল বেলা। আমি এলাহাবাদের বাড়ির বারান্দায় বসে একদল কৃষকের

সঙ্গে কথা বলছিলাম। সহসা আমার পা টলতে লাগল, পড়তে পড়তে কাছের একটা থাম ধরে টাল সামলালাম। দরজা জানালা কাঁপতে লাগল, কাছের স্বরাজভবন থেকে ভীষণ আওয়াজ আসতে লাগল, সেখানে ছাদ থেকে টালি খসে পড়ছিল।"

তিনি তখন বুঝলেন ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু তখনো তিনি কল্পনা করতে পারেন নি যে এই দু'তিন মিনিটের মধ্যে বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্বনাশ হয়ে গেল। যাইহোক, সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি ও কমলা কলিকাতা যাত্রা করলেন। এখানে আসার তিন দিন পরে তিনি সংবাদপত্রে এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কথা সবিস্তারে জানতে পারলেন। কলিকাতায় এসে প্রধানত তিনি কমলার ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। অনেক ডাক্তারের সঙ্গে (তাঁদের মধ্যে বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন অন্যতম) পরামর্শ করে স্থির হোল, দু'একমাস পরে কমলা চিকিৎসার জন্য এখানে আসবেন। পারিবারিক কাজের ফাঁকে বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসের সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। এঁদের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা হয়নি। চিন্তার আদান-প্রদান হোল।

জওহরলাল এই সময় কলিকাতায় তিনটি জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং এই বক্তৃতার দরুণ তাঁর আবার কারাদণ্ড হয়। কলিকাতা থেকে ফিরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। সঙ্গে ছিলেন কমলা। এইবার কন্যা ইন্দিরাকে এখানে রাখার বিষয় চিন্তা করেন। তার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার বেশি দেরী ছিল না। জওহরলাল মেয়েকে সরকারী বা আধা-সরকারী কলেজে পড়াবার বিরোধী ছিলেন। ফিরবার পথে তিনি ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি। বিকেলবেলা।

আগের দিন জওহরলাল এলাহাবাদে ফিরেছেন।

অশ্রান্ত পরিভ্রমণে তখনো তিনি খুব ক্লান্ত। বিকেলবেলায় সবে-মাত্র তিনি ও কমলা চা খাওয়া শেষ করেছেন এমন সময় পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁরা তিনজন মিলে বারান্দায় বসে গল্প করছেন, এমন সময় একখানা মোটর গাড়ি এসে থামল। কী ব্যাপার? মোটর গাড়ি থেকে নামলেন একজন পুলিস অফিসার। জওহরলাল বুঝলেন, আবার জেলে যাওয়ার সময় হয়েছে। তিনি নিজেই এগিয়ে এসে পুলিস অফিসারটিকে বললেন, "আপনার জন্য অনেক দিন ধরে প্রতীক্ষা করছি।"

—আমার কোনো দোষ নেই।

—আপনাকে দোষ দেব কেন? বলুন কি সংবাদ?

—কলিকাতা থেকে ওয়ারেণ্ট এসেছে।

পাঁচমাস তেরো দিন বাইরে কাটিয়ে নেহরু আবার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ফিরে চললেন। তিনি লিখেছেন: "সেইরাত্রেই আমাকে কলিকাতা চালান করা হোল। হাওড়া স্টেশন থেকে পুলিসের একখানা কালোগাড়ি করে আমাকে লালবাজারে আনা হোল। তারপর আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।" তারপর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁর বিচার আরম্ভ হয়। এই বিচার দেখার জন্য আদালতে লোকের খুব ভীড় হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি একটি বিবৃতি পাঠ করলেন। পরের দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারি তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হোল। আরম্ভ হয় তাঁর সপ্তমবার কারাদণ্ড ভোগ। দণ্ডিত আসামীকে আলিপুর সেণ্ট্রল জেলে রাখা হোল।

জেলে আসার তিনমাস পরে একদিন সংবাদপত্রে নেহরু পাঠ করলেন, গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আন্দোলন প্রত্যাহার! নেহরু তখন যারপরনাই

বিস্মিত হোলেন। অবসন্নচিত্তে বারবার তিনি সংবাদটি পাঠ করতে থাকেন। জেলে বসে তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় যেমন রাখতেন, তেমনি য়ুরোপের খবরও রাখতেন। ১৯৩৩ সন থেকে হিটলারের অভ্যুদয়ের পরে থেকে সেই দেশে আন্তর্জাতিক অবস্থা খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। নাৎসীবাদ এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একটা ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কায় সমগ্র য়ুরোপ যেন প্রতীক্ষা করছিল।

এদিকে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন আসন্ন হয়ে এসেছে। গান্ধী তখন ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারে সংকটত্রাণ কাজের ব্যবস্থা করতে পাটনায় অবস্থান করছিলেন। কয়েকজন কংগ্রেস নেতা পাটনায় এসে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলেন। গান্ধী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শুনলেন। এই পরিবেশে গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন ও একটি বিবৃতি মারফৎ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে কংগ্রেসকর্মীরা যেন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জেলে বসে এইসব সংবাদ দিনের পর দিন নেহরু পেতেন আর ভাবতেন—কি ভাবতেন? ভাবতেন কোন্ পথে চলবে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম আর কবেই বা ভারতবাসী লাভ করবে তাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা? কবে হবে পরশাসনের অবসান? আর ভাবতেন তাঁর অসুস্থ মা ও স্ত্রীর কথা। মেয়ের জন্য চিন্তা নেই, তার জন্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আছেন; তাঁর শান্তিনিকেতনে ইন্দিরার দিনগুলি এখন সুখেই কাটবে। কিন্তু কলিকাতার জলবায়ু তাঁর সহ্য হোল না বেশি দিন। এপ্রিলের দুঃসহ গরমে তিনি ঘেমে নেয়ে উঠতেন। যতই গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়তে থাকে ততই তাঁর পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে এবং তাঁর ওজন কমতে লাগল। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাঁকে দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত করা হোল।

দিন যায়। গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এলো।

এখানে এসে নেহরুর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

দুশ্চিন্তার প্রথম কারণ কমলা। এখন তিনি জানতে পেরেছেন যে দুরারোগ্য যক্ষ্মা ব্যাধিতে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আক্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জুন মাসের মধ্যেই কংগ্রেসের ওপর থেকে সবরকম নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোল। নেহরুর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তখন দেশে একটি সমাজতন্ত্রী দলের উদ্ভব হয়েছে। ১৯৩৪-এর মে মাসে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমশঃ এর ভাবধারা একশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসেই পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল। অধিবেশনের আলোচনায় সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি গৃহীত হয়। কিছুকালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত গান্ধী করেছিলেন, তাও কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে।

জেলে বসে এইসব সংবাদ পাঠ করে নেহরুর মন আবার সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়। বিরোধীদলের উদ্দেশে গান্ধীর বক্তৃতা পাঠ করে তাঁর মনে হোল গান্ধী যেন এখন ডিক্টেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। "তোমরা যদি আমার নেতৃত্ব চাও, তা হলে আমার শর্তাবলী তোমাদের গ্রহণ করতেই হবে"—গান্ধীর বক্তৃতার এই কঠিন সুর নেহরু আদৌ পছন্দ করলেন না। নেতার এই একনায়কত্ব ভাবের সঙ্গে তিনি কোনোমতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। বাইরের এই রাজনৈতিক পরিবেশ যখন তাঁর মনকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছিল, ঠিক সেই সময়ে কমলার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটে এবং সেই সংবাদে নেহরু যারপরনাই বিচলিত হোলেন।

জুন মাস থেকে তিনি জেলে বসে তাঁর আত্মচরিত রচনা আরম্ভ করেন। মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘবের এ ছাড়া আর কোনো উপায়

তিনি খুঁজে পান নি। মনের অবসাদকে অন্যপথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই আত্মচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই থেকে সমানে তিনি বইখানি লিখতে থাকেন এবং ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই তাঁর রচনা সমাপ্ত হয়। স্ত্রীর কঠিন অসুখ আরোগ্য হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জুলাই মাসে তাঁর অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয়ে উঠল যে নেহরুকে দেরাদুন জেল থেকে পুলিস পাহারায় এলাহাবাদে নিয়ে আসা হয়। এইখানে আসার পর তাঁকে জানানো হয় যে, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁকে এগারদিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

কমলার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন জওহরলাল।

তিনি দেখলেন, সে সোনার প্রতিমা আর নেই—রোগশীর্ণ দেহে কমলা যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছেন। রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। চকিতে তাঁর মনে পড়ে যায় আঠারো বছর আগের সেই বর্ণগন্ধভরা বসন্ত পঞ্চমীর কথা যেদিন দিল্লী থেকে বধূরূপে এলাহাবাদে তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন কমলা। বিবাহিত জীবনের সেই মধুময় দিনগুলির কথা স্মরণপথে ভেসে উঠতে থাকে—কত সুখের স্মৃতি! মায়ের অসুখের সংবাদ শুনে শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরাও এসেছে। তার বয়স এখন সতেরো। বিয়ের সময়ে কমলার বয়সও ছিল সতেরো।

বাড়িতে আরো একজন রুগী ছিলেন।

তিনি জওহরলালের মা স্বরূপরাণী।

তাঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি বছর—তাঁরো শরীর রোগে জীর্ণ।

পুত্র কারাগারে, পুত্রবধূ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, মেয়েরাও প্রায় জেলে—বিরাট আনন্দভবনের নির্জনতার মধ্যে এই বৃদ্ধা একান্তে তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতেন।

কারামুক্তির সময় নেহরু সরকারের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি

দেন নি, তবে তিনি ঠিক করলেন যে স্বল্পদিন তিনি বাইরে থাকবেন তিনি কোনোরকম রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হবেন না। তাঁর জেলে থাকার সময় অনেক কিছু ঘটে গেছে যার ফলে তাঁর মন তখন যেমন বিক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল অবসাদগ্রস্ত। গান্ধী তখন ওয়ার্ধায়। মনের ভার লাঘব করার জন্য নেহরু তাঁকে একখানি চিঠি লিখলেন। এই চিঠির তারিখ আগস্ট ১৩, ১৯৩৪। প্রায় দু'হাজার শব্দ সংবলিত সুদীর্ঘ এই পত্রে তিনি তাঁর মনের সংশয়, দ্বিধা ও ভয় অবারিতভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই পত্রের কোনো কোনো অংশে জওহরলালের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন আভাসিত হয়েছে সুন্দরভাবে। তিনি লিখেছিলেন : "যখন শুনলাম আপনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন, বিশ্বাস করুন, আমি আমার জীবনের প্রচণ্ডতম আঘাত পেয়েছিলাম। আর আন্দোলন বন্ধ করার স্বপক্ষে আপনি যেসব যুক্তি দিয়েছেন তাতে আমাকে আরো বিস্মিত করে। আমাদের মধ্যে এতকাল যে বন্ধন ছিল, আমার মনে হোল সেই বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে গেল। আমি নিজেকে আবার নিঃসঙ্গ বোধ করলাম। মনে হোল এসব সংবাদ কারাগারে আমার কাছে না পৌঁছলেই যেন ভাল ছিল।···একটি কথা আমার মনের মধ্যে কেবলই উঁকি মারছে—কংগ্রেসকে এখন থেকে শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।"

জওহরলালের এই চিঠির উত্তরে গান্ধী যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি শিষ্যের মানসিক দুশ্চিন্তা সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং যেসব বিষয়ের কথা নেহরু উল্লেখ করেছিলেন তার যথাযথ উত্তর দেন। সবশেষে তিনি লিখলেন—"বিস্ফোরণের পর এখন আমি গঠনমূলক কাজ চাই। যদি আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হয়, তবে এ বিষয়ে তোমার অভিমত আমাকে লিখে জানিও।"

কিন্তু তা জানাবার অবসর জওহরলাল পেলেন না।

এগার দিনের দিন তাঁকে আবার জেলে ফিরে যেতে হয়। এবার তাঁকে দেরাদুনের পরিবর্তে নৈনী জেলে রাখা হোল। মন কিন্তু তাঁর পড়ে রইল আনন্দভবনে—পীড়িতা স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে—অক্ষম মায়ের শয্যাপার্শ্বে। এই সময়ে তাঁকে সপ্তাহে দু'দিন করে ছুটী দেওয়া হোত এলাহাবাদে আসার জন্য। অবশেষে সরকার থেকে প্রস্তাব করা হয়, নেহরু যদি সরকারকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি কোনোরকম রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হবেন না, তা' হোলে তাঁর কারাদণ্ডের অবশিষ্ট কাল মকুব করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কমলার কানে যখন এই কথা পৌঁছিল তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, "এসব কি শুনছি? তুমি নাকি সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে যাচ্ছ? এমন কাজ কোরো না।"

তখন ঠিক হয় কমলাকে ভাওয়ালির স্বাস্থ্যাবাসে স্থানান্তরিত করা হবে এবং অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশুনা করার সুবিধা হবে মনে করে সরকার নেহরুকে আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করেন। ভাওয়ালির কাছেই আলমোড়া। এখানে আসার পর কমলার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। জওহরলালের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। এতদিন স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এখন হিমালয়ের শীতল বাতাসে রুগ্না স্ত্রীর দেহ-মন স্নিগ্ধ ও শান্ত হয়ে উঠতে দেখে উদ্বিগ্ন স্বামী একটু আনন্দিতই বোধ করলেন।

নভেম্বর চলে গেল।

বোম্বাই কংগ্রেস শেষ হয়েছে। এবার সভাপতি ছিলেন বিহারের কংগ্রেসনেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

অধিবেশনের তিনমাস আগে কংগ্রেস থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন গান্ধী। সহকর্মীদের সঙ্গে মতদ্বৈধই ছিল তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ। কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনতান্ত্রিক

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল—জেলে বসে এই সংবাদে নেহরু কিছুটা তৃপ্তি বোধ করলেন।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনের উত্তেজনাও শেষ হয়েছে।

নেহরু কারামুক্তির প্রত্যাশায় দিন গুণতে থাকেন।

নতুন বছর এলো। কমলার স্বাস্থ্যের আবার অবনতি দেখা গেল। ১৯৩৫, ৪ঠা সেপ্টেম্বর। হঠাৎ নেহরু কারামুক্ত হোলেন। তখনো তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পাঁচ মাস বাকী ছিল। কমলা তখন জার্মানিতে। তাঁর অবস্থা সংকটজনক। আলমোড়া জেল থেকে এলাহাবাদ এলেন নেহরু এবং এখানে একদিন অবস্থান করার পর কমলাকে দেখার জন্য বিমানযোগে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন। কন্যা ইন্দিরা তখন সুইজারল্যাণ্ডে। চিকিৎসার কোনো ত্রুটী হোল না। কিন্তু কমলা আর আরোগ্যলাভ করতে পারলেন না। ১৯৩৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি সুইজারল্যাণ্ডে লোজাঁনে তাঁর মৃত্যু হয়। সেইখানেই তাঁর নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে নেহরু কঠিন আঘাত পেলেন।

মৃত্যুর পূর্বে কমলা জেনে যেতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আজ আমরা যখন জননায়ক নেহরুর জীবন আলোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, তাঁর জীবনের সকল রকমের সার্থক পরিণতির পিছনে একটি নারীর অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ, নীরবে দুঃখবহন, ধৈর্য, বীরত্ব আর অবিচলিত নিষ্ঠার প্রভাব রয়েছে।

তিনি শ্রীমতী কমলা নেহরু।

এই তেজস্বিনী নারী তাঁর স্বামীর জীবনে এনেছিলেন শান্তি ও সহধর্মিতা। নেহরুর আত্মজীবনীর এক জায়গায় আছে, কমলা একবার পুলিসের হাতে গ্রেফ্‌তার হোলে উপস্থিত রিপোর্টারগণ তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তখন যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই

তিনি বললেন, "আমি আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপরিসীম গর্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। আশা করি দেশের লোক ঝাণ্ডা উঁচু রাখতে পারবে। স্ত্রীকে কি গভীরভাবেই না ভালবাসতেন নেহরু। সেই ভালবাসার পরিচয় আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। বইখানি তিনি স্ত্রীর নামেই উৎসর্গ করেছেন। সেদিন জওহরলাল স্বদেশে ফিরেছিলেন একটি আধারের মধ্যে কমলার পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে। তাঁর মনের ইচ্ছা—সে ভস্মাবশেষ থাকবে স্বদেশের মৃত্তিকায়।

এলাহাবাদে ফিরলেন জওহরলাল।

দারুণ নিঃসঙ্গতা তাঁকে ঘিরে ফেলল।

জীবনসঙ্গিনী নেই, আজ তাঁর জীবন শূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন। জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা সহসা যেন সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হোল। জনহীন আনন্দভবনে আজ তিনি একা—একা তিনি ফিরে এলেন। সযত্নে কমলার শয়ন কক্ষে তাঁরই শয্যার ওপর রাখলেন তিনি পত্নীর নশ্বর দেহের শেষ ছাইটুকু। সেদিনের সেই বেদনার্ত স্মৃতির প্রসঙ্গে নেহরু লিখেছিলেন ঃ "সে আর নেই, কমলা আর নেই, আমার মন যেন বার বার এই কথাই বলে চলল।"

১২

স্যুইজারল্যাণ্ডে পত্নীর মৃত্যুতে জওহরলালের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হোল। এখন থেকে তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজের মধ্যে, এরই মধ্যে খুঁজতে লাগলেন সান্ত্বনা। তিনি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর শোকের অবসর কোথায়? এখন থেকে তাঁর সামনে রইল বিশাল জনসংঘ, তীব্র কর্মপ্রবণতা আর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। কমলার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই স্বরূপরাণীর মৃত্যু হয় এবং তখন থেকে অতীতের সঙ্গে নেহরুর সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়। কন্যা ইন্দিরাই এখন তাঁর সর্বস্ব। সে তখন অক্সফোর্ডে পড়ছিল।

১৯৩৬-এর পর থেকেই আন্তর্জাতিক ঘটনার স্রোত দ্রুত বেগে যেতে থাকে।

য়ুরোপের আকাশে তখন প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে।

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় সমস্ত পৃথিবী যেন আতঙ্কিত।

এই সময়কার পরিবেশের কথা উল্লেখ করে নেহরু লিখেছেন ঃ "এইসময় য়ুরোপ ও পূর্ব এশিয়ার ঘটনার গতি অন্যান্য অনেকের চেয়ে আমাকে বেশি অভিভূত করল। জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপর আমার বিশ্বাস স্তিমিত হয়ে গেল। প্রলয়ের দিন এসে পড়ল। য়ুরোপের আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে অগ্নি ও ধ্বংস উদ্গীরিত হোতে লাগল। জানি না এ কখন ফেটে পড়বে।"

য়ুরোপ থেকে ফিরবার সময় রোমে মুসোলিনী জওহরলালকে

তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ফাসিস্ত রাজত্বের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করতে নেহরুর আগ্রহ ছিল। কিন্তু তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছিল, ইতালি অন্যায়ভাবে আবিসিনিয়ার ওপর আক্রমণ করেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত নেহরু দুঃখ প্রকাশ করে এক পত্রে মুসোলিনীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে বর্তমানে সাক্ষাৎ করা অসম্ভব।

ভারতে ফিরলেন নেহরু। ফিরেই তিনি কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই তাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে হোল। এই কংগ্রেস বসেছিল লক্ষ্ণৌতে ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে। এই কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, "সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার অর্থই হোল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপোষ করা।" বলেছিলেন: "This is a humiliating position which self-respect itself should prevent one from accepting." কিন্তু তিনি তাঁর অভিপ্রায় মতো কংগ্রেসকে পরিচালনা করতে সক্ষম হোলেন না! দেখলেন, কংগ্রেসের মধ্যে দলগত ভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সর্বত্র সন্দেহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের আবহাওয়া। ওয়ার্কিং কমিটি সভ্যদের মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মনোভাবের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তিনি দেখলেন, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন। তখন তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করার জন্য উন্মুখ হোলেন।

তখন দেশে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে, এবং তাঁকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ

করার স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হোল। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবই গৃহীত হোল না। তাঁর আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রতিও কেউ আগ্রহ দেখাল না। জওহরলাল প্রধানতঃ এই কারণেই পদত্যাগ করতে চাইলেন। তিনি বুঝলেন প্রাচীনপন্থীরা এখন তাঁর নেতৃত্ব চান না। সমাজতন্ত্রের ওপর তাঁর বিশ্বাস তখন আগের চেয়ে প্রবল হয়েছে, কিন্তু গান্ধী পর্যন্ত তা অনুমোদন করতে চাইলেন না। ক্রমে গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর প্রবল মতানৈক্য দেখা দেয়। কথিত আছে, এই সময় গান্ধী একদিন বলেছিলেন, "জওহরলালের উগ্র উক্তির ফলে আমার সারা জীবনের কর্ম পণ্ড হোতে চলেছে।"

শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সংকল্প কংগ্রেস গ্রহণ করে। নেহরু নিজে নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসী প্রার্থীদের অনুকূলে সে সময় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। চার মাস তিনি অক্লান্তভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। "স্থানে স্থানে বিশাল সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হোত, গড়ে বিশ হাজার লোক প্রত্যেক সভাতেই উপস্থিত থাকত। মোটামুটি হিসাবে সভাগুলিতে এককোটী লোক আমার বক্তৃতা শুনেছে।" এই কথা বলেছেন জওহরলাল।

জওহরলালের নির্বাচনী সফরের সময় একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন তিনি এসেছেন পঞ্জাবের একটি গ্রামে। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী তাঁকে ঘিরে সংবর্ধনা জানাল এই বলে—ভারতমাতা কি জয়!

—ভারতমাতা! এর অর্থ কি? নেহরু তাদের জিজ্ঞাসা করেন। তারা জানে না।

—এ মা কে, যাঁকে তোমরা অভিবাদন করছ?

—ইনি ধরিত্রী, বললে একজন কৃষক।

কার ধরিত্রী ? নেহরু জিজ্ঞাসা করেন। তোমাদের গ্রাম ? তোমাদের প্রদেশ ? ভারতবর্ষ ? পৃথিবী ?

তারা সকলে নির্বাক রইল। তখন একজন এগিয়ে এসে বলে, "আপনিই বুঝিয়ে দিন।" নেহরু বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এই ভারতমাতা হচ্ছেন ভারতজননী এবং তাঁরা সকলে তাঁরই সন্তান —ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে যেখানে যত ভারতবাসী আছে সকলেই তাঁর সন্তান। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত জয়ধ্বনি এদেরই উদ্দেশে প্রদত্ত—ভারতমাতার এই কোটি কোটি নরনারীর উদ্দেশে প্রদত্ত।

"কা'রা এই নরনারী ?" তাদের জিজ্ঞাসা করলেন নেহরু। "তারা তোমরা—তোমরা সবাই। তাই যখন তোমরা 'জয়' কথাটি উচ্চারণ কর, তখন তোমরা তোমাদের নিজেদের উদ্দেশেই জয়ধ্বনি করছ, হিন্দুস্থানের সকল ভাইদের উদ্দেশে করছ, সকল বোনেদের উদ্দেশে করছ। এইটা মনে রেখো। তোমরাই ভারতমাতা এবং তোমাদেরই জয়ধ্বনি।"

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হোল।

তখন প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত কি না, এই নিয়ে তুমুল তর্ক উঠল। বড়োলাট কিংবা প্রাদেশিক গভর্ণরেরা হস্তক্ষেপ করবেন না,—এই বোঝাপড়ার শর্তে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজী হোল।

১৯৩৬ সনে অক্লান্তভাবে ভারত-ভ্রমণ নেহরুর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইসময় তিনি ভারতের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছিলেন এবং তামিল, পঞ্জাবী, মারাঠা, শিখ, গুজরাতি, সিন্ধি, অসমীয়া, ওড়িয়া—সকল জাতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষকে। স্বাধীনতালাভের সেই দশ বছর

আগে তিনি ভারতের আত্মার পরিচয় লাভ করেন, বিপুল ভারতীয় জনসংঘের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের তিনি কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ এবং ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। যুগযুগান্তের ভারতের জীবনধারা ও সংস্কৃতিধারা কিভাবে প্রবহমান—তা তিনি যেন এইসময়ে গভীরভাবে অনুভব করতে থাকেন।

জওহরলাল নিজেই বলেছেন : "এই ব্যাপকতর ভ্রমণের আর একটা দিক আমাকে বড়ো বেশি আকর্ষণ করল। আমার পক্ষে ইহা ভারতবর্ষ এবং তাহার জনগণকে আবিষ্কার করবার পরিব্রাজক-ব্রত। মহার্ঘ্য বৈচিত্র্যে ভরা আমার স্বদেশের শত সহস্র রূপ দেখলাম, তথাপি, ভারতীয় ঐক্যের ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। আমার প্রতি লক্ষ লক্ষ প্রীতি-প্রসন্ন বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমি উহার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম। ভারতবর্ষকে আমি যতই দেখি, ততই মনে হয়, ইহার অনন্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের আমি কতটুকুই বা জানি, আবিষ্কার করবার মত আরও কত কিছুই না আছে। মনে হয় তিনি (ভারত) প্রায়ই আমার দিকে চেয়ে হাস্য করেন, কখনো আমাকে বিদ্রূপ করেন ; কখনও মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করেন।"

১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকাল।

নেহরু গেলেন মালয় ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে।

এখানেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না, বিশাল জনতা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান সর্বত্রই তাঁর পিছনে চলল। ব্রহ্মদেশের "পুষ্প-পেলব তারুণ্যে উচ্ছলিত" নরনারীর সঙ্গ তার খুব ভাল লাগল।

ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হোল।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা এবং পরে কংগ্রেসী শাসন আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাংলাদেশে নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ

করেছিল, তাই এখানে গঠিত হয় লীগ মন্ত্রিসভা। এই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ছিল ১৯৩৯ সনের নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯৩৯ সনে সেপ্টেম্বর মাসে য়ুরোপে যখন যুদ্ধ বাধে তখন ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়দের না জানিয়েই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত একটি দেশ বলে ঘোষণা করেন এবং এরই প্রতিবাদে কংগ্রেসের নির্দেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ছয়টি প্রদেশেই পদত্যাগ করেন।

এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণে নেহরু খুব সুখী হন নি।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের বিরোধিতা করেছিলেন। এই দক্ষিণ-পন্থী নেতারা তখন এই অভিমত পোষণ করলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই তাঁরা নতুন শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে নেহরু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নীতি সমর্থন করেন।

১৯৩৭।

এবার হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

সভাপতি—সুভাষচন্দ্র বসু।

কংগ্রেসের বাৎসরিক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে নেহরু একমাসের জন্য য়ুরোপ যাত্রা করেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত মনকে সঞ্জীবিত করা। ১৯৩৮-এর য়ুরোপ। নেভিল চেম্বারলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। এঁরই তোষণনীতি নাৎসী-নায়ক হিটলারের উদ্ধত ক্ষমতাকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলেছিল। নেহরু এসে দেখলেন য়ুরোপের সর্বত্রই বিষাদের কালোছায়া। চারদিকেই আসন্ন ঝড় আসার নিস্তব্ধতা। নেহরু বিমানযোগে এসে পৌঁছলেন স্পেনের বার্সিলোনায়। "এখানে আমি পাঁচদিন থেকে প্রতি রাত্রে বোমা

বর্ষণ দেখতাম। এখানে আরো অনেক কিছু দেখলাম, যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল।"

নেহরু ইংলণ্ডে একমাস কাটিয়ে ভারতে ফিরলেন।

১৯৩৯ সনের প্রথমভাগে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রার্থী হতে অস্বীকার করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হোলেন। এরফলে নানাপ্রকার জটিলতা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হোল যা কয়েকমাস ধরে চলেছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কতকগুলি অশোভনীয় ব্যাপার ঘটেছিল; এর বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এর কিছুকাল পরেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের আপোষমূলক মনোবৃত্তি দেখে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিজেই একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এরই নাম 'ফরোয়ার্ড ব্লক'।

১৯৩৮ সনের শেষভাগে য়ুরোপ থেকে ফিরে নেহরু দুটি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। লুধিয়ানায় নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের গণ-সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এর ফলে অর্ধসামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির প্রগতিশীল আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ভারতে তখন প্রায় ছ'শো দেশীয় রাজ্য ছিল; অধিকাংশ রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। এই অসন্তোষ থেকে মাঝে মাঝে দেখা দিত সংঘর্ষ। নেহরু নিজেই বলেছেন: "এই সকল রাজ্য সম্পর্কে অথবা মধ্যযুগীয় এই নিদের্শনগুলি রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে খেলা খেলেন, সে সম্বন্ধে সংযত ভাষায় কিছু লেখা কঠিন। এগুলিই পরাধীন ভারতে ব্রিটেনের পঞ্চমবাহিনী।"

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ছিল জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতিত্ব। ইহা কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির সহযোগিতায়

গঠিত হয়েছিল। এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে ভারত যাতে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, সেজন্য এদেশে প্রথম চিন্তা করেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তিনি যখন প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন থেকেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। তাঁরই চিন্তার সূত্র ধরে নেহরু এই পথে অগ্রসর হন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এই বিষয়ে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনের তিনিই ছিলেন সভাপতি। সে কথা পরে বলব।

এই প্রসঙ্গে নেহরু লিখেছেন ঃ "ক্রমে জাতীয় পরিকল্পনা, জাতির জীবনে সমস্ত কর্মধারাকেই বেষ্টন করে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য আমরা ২৯টি সাব-কমিটি গঠন করলাম—কৃষি, যন্ত্রশিল্প, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মূলধন এবং এইসব বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে, ভারতের জন্য একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করতে লাগলাম।" একদিন স্বাধীন ভারতে এই পরিকল্পনার প্রয়োগ করা হবে, হয়ত তখন তিনি এইরকম চিন্তা করে থাকবেন। নেহরু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হোলে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক করতে হবে। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে তিনি সমাজতন্ত্রের ধাঁচে ভারতকে গড়তে চেয়েছিলেন।

১৯৩৯। আগস্ট মাস।

য়ুরোপের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল।

এই সংকটের সময় নেহরুর ভারত ত্যাগ করতে ইচ্ছা হোল না। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য তিনি চীনে গিয়েছিলেন। স্বাধীন চীনে তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলেন। তাঁর এই চীন পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

ছিল যে, চীন ও ভারত পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হোক। চীনের নেতারাও যে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন, ইহা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। এই সময়েই মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে নেহরুর অনেকবার সাক্ষাৎ হয় ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হয়। চিয়াং কাইশেককে নেহরু নবজাগ্রত চীনের ঐক্য ও মুক্তি কামনার প্রতীক বলে তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন।

১৯৩৯। সেপ্টেম্বর মাস। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধল।

কংগ্রেস থেকে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রচারিত হোল।

ঐ বিবৃতিতে কংগ্রেসের অতীত ও বর্তমান নীতি পরিষ্কার করে বলা হোল এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ সম্পর্কে শাসকজাতির মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করা হোল। কংগ্রেস বারংবার ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের নিন্দা করেছে, কিন্তু প্রস্তাবে বলা হোল যে, সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ওপর প্রভুত্ব করছে; ভারতবাসী মুখ্যভাবে তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেদিন আমরা কল্পনা করতে পারি, নেহরুর মনে এই চিন্তা জেগেছিল: "এই সাম্রাজ্যবাদ কি অপসারিত হবে? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কি ভারতের স্বাধীনতা এবং গণ-পরিষদের দ্বারা তার শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার স্বীকার করবেন? জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনের জন্য এখনই কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে?"

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের উত্তরে ব্রিটিশ সরকার জানালেন, "তাঁরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য বা war aims পরিষ্কার করে ঘোষণা করতে প্রস্তুত নন, অথবা সরকার পরিচালনের দায়িত্বও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। যে ব্যবস্থা চলছে, তাই-ই চলতে থাকবে এবং ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা যায়

না।” ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই উদ্ধত ঘোষণার ফলেই প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন, কারণ ঐ শর্তে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা হোল।

স্বৈরশাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হোল।

ভারতের রাজনীতিতে জটিল অবস্থার উদ্ভব হোল।

তখনকার সেই পরিবেশ প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখেছিলেন, “আগ্নেয়গিরি এখনো নিস্তব্ধ। কিন্তু উহা বাস্তব এবং ভূগর্ভের অশোভন ধ্বনি কানে আসে।”

দেশের মধ্যে চলতে লাগল অচল অবস্থা।

কংগ্রেস নেতাদের ওপর জারী হোতে লাগল নতুন আইন ও অর্ডিন্যান্স। শুরু হয় গ্রেফ্‌তার। যুদ্ধের গতি ও ইংলণ্ডের বিপদ দেখে কংগ্রেস ইতস্ততঃ করতে থাকে। কংগ্রেসের নেতারা ভুলতে পারেন না গান্ধীর পুরাতন শিক্ষা—“প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগ নিয়ে তাকে বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না।” অন্যদিকে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি, সুভাষচন্দ্র এর বিপরীত মত পোষণ করতেন এবং তিনি বলতে লাগলেন—“ভারতবাসীর এই সুবর্ণ সুযোগ। যুদ্ধের সংকটে জড়িত ব্রিটিশ শক্তিকে চরম আঘাত হানবার পক্ষে আমাদের এই সুযোগ। আমরা যেন এর অসদ্ব্যবহার করি।”

এই পরিবেশে ১৯৪০ সনে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সভাপতি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ঐ সময়ে রামগড়েই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি আপোষ-বিরোধী সম্মেলনও হয়েছিল। সেই একই সময়ে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়। আজাদ তাঁর ভাষণে স্পষ্টভাবে বলেন—“কংগ্রেস সহযোগিতা করবে কি অসহযোগিতা করবে, তা স্পষ্টভাবে আজ নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা সামনে এগিয়ে যাব, না পশ্চাতে, তাও ঠিক করতে হবে। একবার অগ্রসর হোলে আর পশ্চাদপদ হওয়া যায় না।" "To cry halt is to go back and we refuse to go back. We can only, therefore, go forward"—তাঁর এই সুদৃঢ় উক্তি গান্ধী-প্রমুখ আপোষকামী নেতারা পছন্দ করলেন না। নেহরুও না।

ওদিকে লাহোরে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করল।

জিন্না সদম্ভে ঘোষণা করলেন—"পৃথিবীর কোনো ক্ষমতাই আমাদের পাকিস্তান অর্জনে বাধা দিতে পারবে না।" এই লাহোর অধিবেশনেই লীগের পক্ষ থেকে জিন্না স্পষ্টভাবে বললেন—"হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি এবং এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতকে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর পরামর্শে কংগ্রেস ব্রিটেনের কাছে আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল সংঘর্ষ এড়ানো। প্রস্তাবে বলা হোল, ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবেন এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল একটি অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করবেন। এ যদি করা হয়, তাহোলে এই গভর্ণমেণ্ট দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং যুদ্ধায়োজনে সাহায্য করবেন।

লর্ড লিনলিথগো তখন ভারতের বড়োলাট।

১৯৪০, ৮ই আগস্ট, কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কি তা তাঁদের একটি ঘোষণায় জানা গেল। সেই ঘোষণার মর্মার্থ ছিল এই রকমঃ বড়োলাটের কার্যকরী পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে যোগদান করতে আহ্বান করা হবে এবং একটি যুদ্ধ পরামর্শ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু কোনো

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন বর্তমানে বিবেচনা করা যাবে না। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

বড়োলাটের এই ঘোষণায় বোঝা গেল ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে একান্ত অনিচ্ছুক। নেহরু পর্যন্ত এই ঘোষণায় যারপরনাই বিস্মিত ও ব্যথিত হোলেন। "স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে, দুঃখ-কষ্টের পথেই আসবে, আপোষ-আলোচনার পথে নয়"—জননায়ক জওহরলালের মনে তখন জাগল এই চেতনা।

১৩

"With her vast resources, India must play an important part in any scheme of world reorganization. But India can only do so as a free nation, whose energies have been released to work for this great end. Freedom today is indivisible and every attempt to retain imperialist domination in any part of the world will lead inevitably to a fresh disaster."

যুদ্ধের প্রাক্কালে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যুদ্ধ সম্পর্কে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। এটি রচনা করেছিলেন নেহরু স্বয়ং। কংগ্রেসের বহু স্মরণীয় প্রস্তাবের রচয়িতা তিনি ; কিন্তু এই প্রস্তাবটির মধ্যে তাঁর দূরদর্শিতা ও স্বাধীনভারত সম্পর্কে যে ভবিষ্যদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল তা লক্ষ্য করার বিষয়। শুধু তাই নয়। যুদ্ধকে তিনি কেবলমাত্র দুইটি শক্তির সশস্ত্রবাহিনীর সংঘর্ষ বলে দেখেন নি, তিনি এর মধ্যে দেখেছেন একটি আন্তর্জাতিক সংকট। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ইতিহাসে তাই ১৯৩৯ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বরের এই প্রস্তাবটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঐ বৈঠকেই নেহরু, আজাদ ও প্যাটেলকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির ওপর ভার ছিল যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থার ফলে উদ্ভূত সমস্যার আলোচনা করা। এই কমিটি অবশ্য বেশি দিন সক্রিয় ছিল না ; ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড় কংগ্রেসে এর অস্তিত্ব

বিলুপ্ত হয়। গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের তখন মতান্তর চলছে। এই সময় তিনি আবার আপোষ-আলোচনার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু বড়োলাট লিনলিথগো ও লণ্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেনঃ "বর্তমান সময় ভরতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করার জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়।"

এরই জবাবে সেদিন নেহরু এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেনঃ "আমরা বাজারের মনোভাব নিয়ে কোনো দাবীই উত্থাপন করিনি।" তিনি আরো বলেছিলেন—"We must see India in the picture of the world freedom." তখন বড়োলাট ভারতবর্ষের পঞ্চাশজন বাছাই করা নেতাকে নিমন্ত্রণ করলেন আলোচনার জন্য। গান্ধী ও নেহরু দুজনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই আলোচনা-বৈঠকে বিশেষ কোনো ফল হয় নি।

১৯৪০। নববর্ষের প্রারম্ভেই গান্ধী জিন্নার সহযোগিতালাভের জন্য আর একবার চেষ্টা করলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক ভারতীয় জাতিতে জিন্না বিশ্বাস করতেন না; তাই তিনি সেদিন গান্ধীকে বলেছিলেন—"যে ভারতীয় জাতির অস্তিত্বই নেই, তাই দিয়ে আপনি আরম্ভ করতে চান; আমি এর মধ্যে নেই।" তখন পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্নে তিনি মশগুল হয়ে আছেন, তাই জিন্না গান্ধীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এইটাই প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা ভারতকে বলপূর্বক পদানত রাখতে চান। ১৯৪০ শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল নেহরু সমেত ওয়ার্কিং কমিটির এগারজন সদস্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৭৬ জন সদস্য, ২৯ জন ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং প্রায় ৪০০-ওপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নেহরুর এইবারের কারাদণ্ডের মেয়াদ ছিল

চার বছর। এই নিয়ে তাঁর আটবার কারাদণ্ড হয়। গোরক্ষপুর জেলের মধ্যে যখন একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর বিচার হয় তখন তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুর যত বেশি না ছিল, তার চেয়ে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে ছিল একটি তীব্র indictment বা অভিযোগ। তাঁর বহু বিবৃতির মধ্যে এটি তাই স্মরণীয় হয়ে আছে।

নেহরু সেদিন ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন: "I stand before you, sir, as an individual being tried for certain offences against the State. You are a symbol of that State. But I am something more than an individual also; I, too, am a symbol at the present moment, a symbol of Indian nationalism, resolved to break away from the British Empire and achieve the Independence of India."

চিরস্বাধীনতাপ্রিয় নেহরু সেদিন যে নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তা একমাত্র তাঁর মতোন দেশপ্রেমিকেরই যোগ্য।

কিন্তু তাঁর এই বারের কারাবাস এক বছরকালও স্থায়ী হয় নি। হঠাৎ ১৯৪১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর, ব্রিটিশ সরকার নেহরুকে এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান করেন। এর তিনদিন পরেই জাপান পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করল। তখন নেহরু বুঝলেন যুদ্ধের অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠতে বাধ্য এবং জাপান ও আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে, হয়ত এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই পটভূমিকায় ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের মধ্যে অতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) স্বাক্ষরিত হয়। তার কিছু আগে নেহরু রুজভেল্টের চার প্রকার স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিবৃতিটি পাঠ করেছেন। এখন তিনি

এই সনদের আট দফার মধ্যে একটি দফায় পাঠ করলেন: "All people shall have their right to choose their own form of government, and that sovereign rights and self-government shall be restored to those who have been forcibly deprived of them."

জেলে বসে সনদের অন্তর্গত এই আশ্বাসবাণী পাঠ করে নেহরুর মনে হোল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা'হোলে নতুন যুগ আসার আর দেরী নেই। পরবর্তীকালে এই অতলান্তিক সনদের ওপর ভিত্তি করেই স্থাপিত হয় UNO বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। তারপর যখন পার্ল হারবার আক্রান্ত হয়, তখন অনেকেই এই আশা করেছিলেন যে, হয়ত বা ব্রিটিশ সরকার তাঁদের কঠিন মনোভাব পরিবর্তন করবেন, সম্মানজনক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করবেন এবং অবিলম্বে ভারতে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হবে। কিন্তু এর কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

১৯৪২, ৮ই মার্চ।

রেঙ্গুনের পতন হোল।

জাপানের দুর্বার আক্রমণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি রীতিমত পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এই ঘটনার ঠিক তিনদিন পরেই চার্চিল ঘোষণা করলেন: "ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা সহ স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করা হচ্ছে। পরিকল্পনাটি ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছেন।"

তখন জাপানের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা যাতে যুদ্ধ করে, সেজন্য ব্রিটিশ সরকার একটি প্রস্তাব দিয়ে ক্রিপসকে পাঠালেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে, ক্রিপস দৌত্য সফল হবে, কিন্তু তা হয়নি।

ক্রিপস তখন পার্লামেণ্টে হাউস অব কমন্স-এর নেতা ছিলেন এবং গান্ধী, নেহরু ও জিন্নার তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার ওপর কংগ্রেস নেতাদের—এমন কি জিন্নারও খুব আস্থা ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকারের মনে হোল কংগ্রেসকে যদি কেউ বোঝাতে পারেন তবে তিনি হোলেন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

২২শে মার্চ ক্রিপস দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন।

সকলেই আশান্বিত হোলেন।

তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল তিনি সরাসরি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বড়োলাট এতে মনঃক্ষুণ্ণ হোলেন। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত আলোচনা চলল। কিন্তু কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নের সঙ্গে মুসলিম লীগের ভারতবিভাগের আদর্শ মিলল না শেষ পর্যন্ত। কোনো মীমাংসা হয় না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হোল পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে সহযোগিতা করা যাবে না; অন্যদিকে লীগ জানাল তাদের পাকিস্তানের দাবী মেনে না নিলে ইংরাজকে সাহায্য করা হবে না। ক্রিপস দৌত্য ব্যর্থ হোল।

ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতা দেশের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সনের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র পুলিসের সতর্ক চক্ষে ধুলো দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধান করে বার্লিনে গিয়ে পৌঁছেছেন। তারপর সেখান থেকে সাবমেরিনে সিঙ্গাপুরে এসে তিনি গঠন করেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। মালয় থেকে বেতারে ভারতবাসীর কানে এসে পৌঁছয় তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণী। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য—এই সংবাদে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগে ভারতের নর-নারীর চিত্তে। ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য সুভাষচন্দ্র বেতারে সেই সময়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে।

দিন যায়।

যুদ্ধের অবস্থা ঘনীভূত হয়।

ক্রিপস দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেস গান্ধী নেতৃত্বের জন্য ব্যাকুল হয়। আবার গান্ধীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হোল। তিনি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে মুক্তিকামী ভারতবাসীকে একটি পথের নির্দেশ দিলেন—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আর ব্রিটিশ শাসকবর্গকে বললেন—"ভারত ছাড়ো"। তারপর ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসল। এই স্মরণীয় অধিবেশনে ইংরেজশাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার দাবী জানান হোল। একটি প্রস্তাবে বলা হোল ঃ এই দাবী যদি ব্রিটিশ সরকার না মেনে নেন, তা'হোলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে এবং সে আন্দোলন চালাবার ভার থাকবে গান্ধীর ওপর।

সরকার প্রমাদ গণলেন।

এই সংকটজনক অবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যদি গণ-আন্দোলন শুরু হয় তবে ভারতের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ৮ই আগস্ট রাত্রে বোম্বাইতে অধিবেশন শেষ হয়। ৯ই আগস্ট ভোর হওয়ার আগেই নেতারা বন্দী হোলেন এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হোল। জেলে যাওয়ার আগে ভারতকে গান্ধী দিয়ে গেলেন নতুন মন্ত্র—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" অমনি কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু।"

আরম্ভ হোল আগস্ট বিপ্লব।

"Do or Die"—গান্ধীর এই একটিমাত্র কথায় সারা দেশে জাগল প্রচণ্ড বিক্ষোভ—সে বিক্ষোভ স্মরণ করিয়ে দেয় ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের কথা। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হোল।

গান্ধীকে রাখা হোল পুণায় আগা খাঁর প্রাসাদে।

নেহরু প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের রাখা হোল আমেদনগর দুর্গে। জওহরলালের নবম কারাবাসই তাঁর জীবনের দীর্ঘতম এবং শেষ কারাবাস। বোম্বাই থেকে দুশো মাইলের কিছু দূরে অবস্থিত এই দুর্গটি ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি হয়। এই দুর্গ থেকেই বীরাঙ্গনা চাঁদবিবি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে একদা সংগ্রাম করেছিলেন। এইখানেই সরোজিনী নাইডু সমেত ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্যকে আটক রাখা হোল। রাজবন্দীদের পক্ষে এরকম কারাবাস ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। এর পূর্বে তাঁরা সাধারণ জেলেই কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, দুর্গের অভ্যন্তরে বন্দী জীবন যাপন তাঁদের পক্ষে এই প্রথম। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড়ো। নেহরুর অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন হরেকৃষ্ণ মহতাব, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আচার্য কৃপালনী, আসফ আলি, শঙ্কররাও দেও, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, ডাঃ পট্টভি সীতা-রামাইয়া, গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও মৌলানা আজাদ।

প্রথমে তিন সপ্তাহ নেহরুপ্রমুখ বন্দীদের সংবাদপত্র পাঠের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে বাইরের জগতে কি ঘটছিল তখন, তার কোনো সংবাদই তাঁরা পাননি। এই আমেদনগর দুর্গে বন্দী থাকা-কালীন অবস্থায় নেহরু তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *The Discovery of India* রচনা করেন। আলমোড়া জেলে লিখেছিলেন আত্মচরিত, এখানে বসে লিখলেন "ভারত আবিষ্কার"।

দিন যায়।

ক্রমে জেলের মধ্যে বাইরের ঘটনার সংবাদ আসতে থাকে।

৯ই আগস্ট যেদিন তাদের অতর্কিতে বন্দী করা হয়েছিল, তারপর থেকে ভারতবাসীর মনে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার আভাস তাঁরা কিছুদিন পরেই সবিস্তারে জানতে পারলেন। জানতে পারলেন ঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ সারা ভারত জুড়ে উঠেছে জনগণের ক্রুদ্ধ চিৎকার - করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

সবাই সংকল্প করেছে দেশের এই শেষ সংগ্রামে প্রাণ দেওয়ার জন্য। নেতা নেই, তবু জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের আগুন। সে আগুনের লেলিহান শিখায় রাঙিয়ে ওঠে ভারতের আকাশ। জনগণ নিজেরাই এগিয়ে এসেছে নেতৃত্ব করতে। তাঁরা আরো জানতে পারলেন—সরকার গুলি চালিয়েছেন, বোমা ফেলেছেন নিরস্ত্র জনতার ওপর। মুক্তি-পিয়াসী জনগণ মেতে উঠেছে ধ্বংসলীলায়। তারা থানা, ট্রেজারী প্রভৃতি আক্রমণ করেছে, উপড়ে ফেলছে রেললাইন, কেটেছে টেলিগ্রামের তার, লুঠ করেছে ডাকঘর। সরকার ভেবেছিলেন, নেতাদের আটক করলে আন্দোলন হবে না। কিন্তু এখন তাঁরা বুঝলেন যে, ফল বিপরীত হয়েছে। সরকারের উৎপীড়ন আর দীর্ঘদিনের পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতবাসী এবার মুক্তির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

জেলে বসেই নেহরু জানতে পারলেন—সংগ্রাম সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে। বিদ্রোহীরা নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে জাতীয় সরকার। একদিকে চলেছে নির্বিচারে জেল জরিমানা ফাঁসি, আর মেসিন গান থেকে গুলি। অন্যদিকে চলেছে ভৈরব-গর্জনে জনতার বিদ্রোহ। মেদিনীপুরের তিয়াত্তর বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা, আসামের নাগারাণী গুইদালো, পঞ্জাবের ভোজেপুরী ফুকোননী আর তেজপুরের কনকলতা—এমনি আরো অনেক বীরাঙ্গনা যোগ দিয়েছিলেন এই স্মরণীয় আগস্ট বিপ্লবে; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাণও দিয়েছিলেন। সাতারা, অস্থি ও চিমুর—নতুন গরিমায় জেগে উঠেছে ভারতের মানচিত্রে।

ভারতে যখন আগস্ট বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। এই বাহিনীর সৈন্যদের কণ্ঠে তিনি দিয়েছিলেন দুটি মন্ত্র—'চলো দিল্লী' আর 'জয় হিন্দ'। 'দিল্লী চলো'

এই ধ্বনি কাঁপিয়ে তোলে আকাশ-বাতাস, পাহাড়ে-পর্বতে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। বায়ুতরঙ্গে ভেসে আসে সে প্রতিধ্বনি ভারতে—জাগিয়ে তোলে ভারতবাসীর মনে নতুন উদ্দীপনা।

এই দুই আন্দোলনই সেদিন মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল।

১৯৪৩। জানুয়ারি।

জেল থেকে গান্ধী বড়োলাট লিনলিথগোকে চিঠি লিখলেন।

তার জবাবে বড়োলাট কংগ্রেসকে দায়ী করলেন আগস্ট বিপ্লবের জন্য। এবং বললেন, "কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি এই আন্দোলনের নিন্দা করা হয় তবেই গান্ধীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন।"

গান্ধী তখন একুশ দিনের জন্য অনশন করবেন বলে জানালেন।

এই দীর্ঘদিনের অনশনের ফলে যদি জেলের মধ্যে গান্ধীর মৃত্যু হয়, এই আশঙ্কায় সরকার সাময়িকভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে চাইলেন। গান্ধী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আমেদনগর দুর্গে জওহরলালের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ভরে উঠল। এখন বাপুজীর বয়স অনেক হয়েছে, স্বাস্থ্যও আগের মতোন নেই, এমন অবস্থায় এই অনশন—এর পরিণতি আশঙ্কা করে তিনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন হোলেন। মৌলানা আজাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি। জেল থেকে তিনি লিনলিথগোকে এক পত্রে জানিয়ে দিলেন যে, আগস্ট বিপ্লবের দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, সরকারের। এই চিঠির মুসাবিদ ছিল জওহরলালের।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

সাড়ে সাত বছর বড়োলাটগিরি করার পর লিনলিথগো স্বদেশে ফিরে গেলেন। নতুন বড়োলাট নিযুক্ত হোলেন লর্ড ওয়েভেল। বাংলায় তখন চলেছে মন্বন্তর আর দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের সেই মন্বন্তরে

লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল। মানুষের তৈরী ছিল এই ভয়াবহ মন্বন্তর।

১৯৪৪। ২২শে ফেব্রুয়ারি।

জেলের মধ্যে কস্তুরবা-র মৃত্যু হোল। স্বামীর সঙ্গে তিনিও জেলে গিয়েছিলেন। একাদিক্রমে বাষট্টি বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর এই পত্নীবিয়োগ গান্ধীর জীবনে নিয়ে এলো অসীম শূন্যতা। ৫ই মে কারামুক্ত হোলেন তিনি অসুস্থ অবস্থায়। আমেদনগর দুর্গে বসে এইসব সংবাদ পেলেন নেহরু। কস্তুরবা-র মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হোলেন। জেল থেকে বেরিয়ে গান্ধীর প্রথম কাজ ছিল দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটানো। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ তখনো পর্যন্ত আমেদনগর দুর্গে অবরুদ্ধ। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার অনুমতি চেয়ে গান্ধী ব্যর্থকাম হোলেন। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে থাকে গান্ধী ও ওয়েভেলের মধ্যে। ওয়েভেলের সেই এক কথা—"আমাদের মধ্যে বর্তমানে সাক্ষাৎকারের কোনো মূল্য নেই।" গান্ধী তখন চাইলেন জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে। জিন্না সম্মত হোলেন না ; তিনি জানালেন ঃ "আমাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের কোনো ভূমি নেই ; আপনার আদর্শ অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারত ; কিন্তু যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি, আমি তাই ভারতবিভাগের পক্ষপাতী।"

ভারত বিভাগ!

এ যে গান্ধীর কল্পনার বাইরে।

এ যে তাঁর আজীবনের পোষিত আদর্শের পরিপন্থী।

না হোল স্বাধীনতা লাভ, তবু ভারতবিভাগ হোতে দেব না কিছুতেই—মনে মনে চিন্তা করেন গান্ধী। তবু গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হোল বোম্বাইতে মালাবার হিলে অবস্থিত জিন্নার বাড়িতে। ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে আঠারো দিন ধরে চলেছিল এই আলোচনা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনো ফলই হোল না এই সাক্ষাৎকারের। গান্ধী তাঁর আদর্শে অবিচল রইলেন—যেমন রইলেন জিন্না তাঁর পাকিস্তানের আদর্শে।

ভারতের ইতিহাস তখন থম্‌থম্‌ করছে।

য়ুরোপে যুদ্ধও শেষ হয়ে আসছে।

১৯৪৫-এর মে মাসে বার্লিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান ঘোষিত হোল। ১৫ই জুন কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হোলেন। নেহরুর সর্বশেষ কারাবাসও শেষ হোল।

২৫শে জুন সিমলায় ওয়েভেল এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। কংগ্রেস সে বৈঠকে যোগ দিল। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বড়োলাটের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলে লীগ ও কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার বিষয় আলোচিত হয় বৈঠকে ; কিন্তু দুইদলের সদস্যের সংখ্যা নিয়ে আজাদ ও জিন্নার মধ্যে দেখা দেয় মতভেদ। কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের শেষে বিলেতে তখন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়েছে।

এবার শ্রমিকদল নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এ্যাটলি তখন প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই নির্দেশে ওয়েভেল সিমলায় সকল নেতাদের আহ্বান করেছিলেন। ঘটনার স্রোত দ্রুত বইতে থাকে। নেহরুর মনে হোল—স্বাধীনতা এখন আর দূরবর্তী নয়। "We are very near our goal—" এই কথা সেদিন শোনা গিয়েছিল কংগ্রেস সভাপতি আজাদের কণ্ঠে।

ভারত সেদিন সত্যিই তার লক্ষ্যে পৌঁছেছিল।

২১শে আগস্ট ভারত সরকারের এক ঘোষণায় জানা গেল কেন্দ্রে ও প্রাদেশিক আইন-সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন হবে। নির্বাচনে কংগ্রেস সব প্রদেশের প্রায় সবগুলো অ-মুসলমান আসন এবং

যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও আসামের কতকগুলো মুসলমান আসন দখল করল। সিন্ধু ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে আবার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হোল।

১৯৪৬। ফেব্রুয়ারি।

বিলেতে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং এইজন্য একটি মন্ত্রীমিশন শীঘ্রই ভারতে আসবেন এখানকার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। পার্লামেণ্টের তিনজন মন্ত্রী (লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ· জি· আলেকজাণ্ডার) নিয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল। আবার বৈঠক বসল সিমলায়। এই বৈঠকে কংগ্রেস ও লীগ ছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গও যোগ দিলেন। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ছিল—ভারত বিভাগ করে হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথকভাবে স্বাধীনতা দেওয়া।

ভারত বিভাগ !

এ যে অকল্পিত ব্যাপার। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজী হোল না। লীগও রাজী হোল না—অবশ্য ভাগের অংশ কম হওয়ার দরুণ। মন্ত্রীমিশন ফিরে গেলেন। তবু এই রাজনৈতিক নৈরাশ্যের পরিবেশের মধ্যে একদিন দিল্লীতে নেহরু একজন বিদেশী সংবাদদাতাকে আজাদের সেই কথার পুনরুক্তি করে বলেছিলেনঃ "We are very near our goal."

১৪

অবশেষে সেই লক্ষ্যে কংগ্রেস উপনীত হোল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষ ঐদিন তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ করে।

নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদেশী শাসক এবার সত্যি সত্যিই বিদায় নিলো। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও এই ক্ষমতার হস্তান্তর সবই হয়েছিল দেশ-বিভাগের ভেতর দিয়ে। যদিও স্বাধীনতালাভের পূর্বে কংগ্রেসের ছ'জন ও লীগের পাঁচজনকে নিয়ে দেশে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল, তবুও দেখা গেল যে, লীগ গণ-পরিষদের কাজে যোগ দিল না। এই অন্তবর্তী সরকার গঠিত হওয়ার কিছু পরে দেশের কয়েকটি স্থানে লীগের প্ররোচনায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল তাতে একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত না হোলে ভারতবর্ষে না হবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ; আর না হবে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান। ব্রিটিশ সরকারও এই সত্যটা তখন উপলব্ধি করেন এবং এরই ফলে মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তান —এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়।

এই ভারত বিভাগ কংগ্রেসকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়।

অন্তবর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৫-এর ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে গণ-পরিষদের উদ্বোধন হোল। পরিষদে যে ৭৪ জন মুসলিম লীগ প্রতিনিধির যোগদানের কথা ছিল তাঁরা কেউ এলেন না। তখন বোঝা গেল ভারতবিভাগ অনিবার্য। লীগের বয়কট সত্ত্বেও পরিষদের কাজ চলতে থাকে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণ-পরিষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হোলেন। এই গণ-পরিষদেরই উপর স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। এই পরিবেশে এদেশে ১৯৪৭, ২২শে মার্চ নতুন বড়োলাট হয়ে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। নতুন বড়োলাট এসেই লাটভবনে নেহরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরে তাঁকে বলেছিলেন: "মিস্টার নেহরু, ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাবার জন্য আমাকে সর্বশেষ বড়োলাট বলে আপনি মনে করবেন না, বরং নতুন ভারতের প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবেই আমাকে মনে করবেন।"

সেদিন এই কথা শুনে নেহরু মৃদু হেসেছিলেন। বন্ধুত্বের হাসি।

"এখন বুঝতে পারলাম লোকে যে বলে আপনার আকর্ষণ অত্যন্ত মারাত্মক, সেটা মিথ্যা নয়।" উত্তরে বলেছিলেন নেহরু।

মাউণ্টব্যাটেন এসেই ঘোষণা করলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের সর্বশেষ তারিখ ধার্য হয়েছে ১৯৪৮-এর জুন মাসে। নব্বই বছর আগে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সাক্ষাৎ শাসনের অধীনে এসেছিল, তখন সম্রাজ্ঞী ছিলেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, আর আজ, ইতিহাসের এক বিচিত্র পরিহাসের ফলে, তাঁরই নাতির ছেলের (great-grandson) ওপর সেই শাসনের অবসান ঘটাবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ভারত হবে একটি রিপাব্লিক এবং সে কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না তা তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

মাউণ্টব্যাটেন এলেন।

নেহরুর সঙ্গেই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এক বছরের কিছু বেশি আগে সিঙ্গাপুরে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়েছিল। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিযানের শেষ পর্ব চলছিল। প্রথম সাক্ষাতেই দুজনে দুজনের বন্ধু হোলেন। এই বন্ধুত্ব ছিল যেমন গভীর তেমনি আন্তরিক। মাউণ্টব্যাটেনের বন্ধুত্বের প্রভাব তখন থেকেই নেহরুর জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। অনেক বিষয়েই তিনি মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। মালয় থেকে নেহরু যখন ফিরলেন তখন তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"মাউণ্টব্যাটেন কি আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন?"

নেহরু হেসেছিলেন। "আমরা দুজনে দুজনকেই কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলাম।" মালয়ে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হোল ভারতবর্ষে স্বাধীনতার প্রাক্কালে। নেহরু তখন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ংবদ মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাবের দ্বারা সম্পূর্ণভাবেই আচ্ছন্ন হয়েছেন। যাই হোক, দিল্লীতে লাটভবনে তাঁদের দুজনের মধ্যে সেই সাক্ষাতের সময় যেসব কথাবার্তা হয় সেগুলি লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার আভাস ছিল তার মধ্যে।

"আপনার মতে ভারতের সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটা কি?" জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

"অর্থনৈতিক।" বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলেন নেহরু।

১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসে সাম্প্রদায়িক অবস্থার কোনো উন্নতি হোল না দেখে মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে আর বিলম্ব করলে আত্মঘাতী এই গৃহ-যুদ্ধের পরিণাম ভারতবর্ষের পক্ষে ভয়াবহ হবে। কেন্দ্রে যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তা নামেমাত্র—লীগ ও কংগ্রেস সদস্যগণ পরস্পরের বিপরীত মনোভাব নিয়ে দেশ শাসন করছেন।

ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো নির্দেশই পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। দেশ বিভাগ ভিন্ন উপায় নেই।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত গান্ধী ছিলেন দেশ-বিভাগের বিপক্ষে। ভীষণ-ভাবে বিপক্ষে। "যদি ভারত-বিভাগ করতেই হয় তবে তোমরা তা করতে পার একমাত্র আমার মৃতদেহের ওপর"—গান্ধীর এই কথা মাউণ্টব্যাটেনের জানা ছিল। নেহরু ও প্যাটেল তখন বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হয়ে ভারত-বিভাগের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তখনো পর্যন্ত কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন কোনো একটি পরিকল্পনা ভারতের নেতাদের সামনে উপস্থিত করেন নি। তাই নেহরু একদিন তাঁকে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললেন—"এ রকম অচল অবস্থা চলতে পারে না। আপনি যদি সঠিক কোনো পরিকল্পনা উপস্থিত না করেন আমি কিন্তু তা' হোলে পদত্যাগ করব।"

প্যাটেল আরো স্পষ্ট ভাষায় বললেন—"আপনি নিজেও শাসন করবেন না, আমাদেরও শাসন করতে দেবেন না।"

১৯শে এপ্রিল।

মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করলেন দেশ-বিভাগ অনিবার্য। এ ছাড়া পথ নেই। লোক মারফৎ তিনি তাঁর পরিকল্পিত পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নার মনোভাব জানতে চাইলেন। বিভক্ত পঞ্জাব ও বাংলা-দেশের অর্ধেক নিয়ে জিন্না সন্তুষ্ট হবেন কিনা? কেননা এই দুই প্রদেশেই অ-মুসলমান জনসংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

"একেবারে পাকিস্তান না হওয়ার চেয়ে কীট-দষ্ট পাকিস্তান বরং শ্রেয়—" সেদিন অনমনীয় জিন্নাকে এই কথা বলতে হয়েছিল গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই। তখন তিনি সত্তরের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিগত দশ বছর ধরে তিনি ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আসছেন। সেই তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্র—

পাকিস্তান গঠিত হবে আর তিনি হবেন সেই রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল—মনের মধ্যে এই ইচ্ছা পোষণ করতেন লীগ-নায়ক জিন্না। ভেবেচিন্তেই কি সেদিন তিনি বলেছিলেন!"—"Better a moth-eaten Pakistan than no Pakistan at all."

জিন্নার কাছ থেকে এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের সাক্ষাৎ হোল ২৩শে এপ্রিল। ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের একান্ত সচিব ছিলেন এ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন। তিনি তাঁর ***Mission with Mountbatten*** গ্রন্থে লিখেছেনঃ "ঐদিন সাক্ষাতের সময় দেখা গেল জিন্নার সে অনমনীয় মনোভাব আর নেই। তিনি পঞ্জাব ও বাংলা বিভাগে সম্মত হয়েছেন।"

কিন্তু জিন্নার এ মনোভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই তিনি তাঁর স্বমূর্তি প্রকাশ করলেন। দাবী করলেন অবিভক্ত পঞ্জাব ও বাংলার। এই সংকটকালে মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করলেন, বিলম্বে কাল হরণের প্রয়োজন নেই। ১৯৪৮-এর জুনের জন্য অপেক্ষা করা দরকার নেই—তার আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর জুন মাসের গোড়ার দিকেই তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর পরিকল্পনার খসড়া। এই খসড়াই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অনুমোদন করলেন এবং পরে ঐ খসড়া কিছু পরিবর্তিত আকারে ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের দুইটি রাজনৈতিক দলের কাছে অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগের কাছে পেশ করা হোল। এরই নাম ৩রা জুনের প্ল্যান। স্মরণীয় এই প্ল্যান কংগ্রেস ও লীগ দুই দলই গ্রহণ করল। তখন এই পরিকল্পনা অনুসারেই ভারত-বিভাগ মেনে নেওয়া হোল; সেইসঙ্গে পঞ্জাব ও বাংলা বিভাগও। গান্ধীর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। যখন মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানে স্বাক্ষর দান করে নেহরু এলেন গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তখন তাঁর মুখে হাসির রেখা ছিল না।

নেহরুকে তিনি শুধু বলেছিলেনঃ "আমার সারা জীবনের সাধনা মাটিতে মিশিয়ে গেল।"

কিন্তু ইতিহাসের গতি তখন দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে।

পরিতাপের সময় নেই, বিলাপের অবকাশ নেই।

ভারত-বিভাগ তাই মেনে নিতেই হোল।

১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের অবসান হোল।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতালাভ করল। দিল্লীর লালকেল্লায় ঐদিন মধ্যরাত্রে উঠল স্বাধীন ভারতের অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে উঠল নতুন ভারত—স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারত। সেদিন জাতির উদ্দেশে নেহরু বলেছিলেন, "ভারত, ভারতের নরনারী এবং পৃথিবীর মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার শপথ আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। নির্লিপ্ত আরাম বা বিশ্রামের দিন আজ নয়, বরং এখন থেকে নিরলস কর্মের মধ্যে ডুবে যেতে হবে আমাদের। ভারতের সেবা মানেই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর সেবা। এই সেবার অর্থ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং ব্যাধি ও বৈষম্যের অবসান।"

সেদিন থেকে জওহরলালের জীবনে আরম্ভ হোল এক নতুন অধ্যায়। যিনি ছিলেন এতকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক সৈনিক ও সুদক্ষ সেনাপতি, অতঃপর তিনিই এখন আত্মপ্রকাশ করলেন স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে। এখন থেকে নেহরুকে আমরা দেখব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায়।

১৫

দিল্লীর কনকনে শীতের বাতাসের বুক চিরে ভেসে আসে গান্ধীর প্রিয় গান ঃ

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিতপাবন সীতারাম,
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সম্মতি দে ভগবান।

এই গান গেয়েই তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনা সভা শেষ হোত। সেদিন ছিল ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি। সন্ধ্যাবেলা। গান্ধীর জীবনে সেই শেষ দিন যখন তিনি সান্ধ্য প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন।

এর ঠিক ন'দিন আগে তিনি অনশন ভঙ্গ করেছেন। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দরুণ অত্যন্ত মর্মাহতচিত্তে তিনি এই অনশন করেছিলেন। এও ছিল তাঁর জীবনে শেষ অনশন। সেই অনশনের সময় তিনি ভ্রাতৃভাবে থাকার জন্য হিন্দু, শিখ ও মুসলমান—এই তিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে শেষবারের মতোন আবেদন জানালেন। সেদিন ছিল ২০শে জানুয়ারি। বিড়লাবাড়ির সংলগ্ন উদ্যানে সান্ধ্য প্রার্থনা সভা হোত প্রতিদিন। গান্ধী তখন বিড়লাবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেদিন—সেই ২০শে জানুয়ারি—সভায় গোলমাল হোল ; কে যেন বোমা ছুঁড়ল গান্ধীকে লক্ষ্য করে। সভায় তুমুল গোলমাল দেখা দিল। সভাস্থলেই মদনলাল নামে পশ্চিম পঞ্জাব থেকে আগত একজন উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পকেটে একটি হাতবোমা পাওয়া গিয়েছিল।

গান্ধী কিন্তু এই ঘটনায় রইলেন অবিচলিত। পরের দিন প্রার্থনা-সভায় তিনি, যে লোকটি বোমা ফেলেছিল তার উদ্দেশে মৃদু তিরস্কার-বাণী বর্ষণ করলেন। হয়ত এই যুবকটি তাঁকে হিন্দুধর্মের একজন শত্রু মনে করে তাঁর প্রাণ নিধনের চেষ্টা করেছিল। দিল্লীর পথে মুসলমানেরা নির্ভয়ে চলা-ফেরা করতে পারবে, আর তাদের যেসব মসজিদ হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুরা জোর করে দখল করেছিল সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আশ্বাস পেয়েই তিনি তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। এজন্য চরমপন্থী অনেক হিন্দু ও শিখ নেতা গান্ধীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

গান্ধী যখন অনশন করেন তখন তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য নেহরুও অনশন আরম্ভ করেন। তখন গান্ধী ১৮ই জানুয়ারি অনশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করে নেহরুকে স্বহস্তে লিখে পাঠালেন: "May you long remain Jawahar, the Jewel of India". অর্থাৎ "ভারতের রত্নহিসেবে তুমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাক, জওহর।"

যাই হোক, ২০শে জানুয়ারি প্রার্থনাসভায় বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর প্যাটেল ও নেহরু দুজনেই অত্যন্ত বিচলিত হন এবং বাপুর জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা চিন্তা করতে থাকেন। সাদা পোষাকে পুলিস তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকুক—এই রকম ব্যবস্থা তাঁরা করতে চাইলেন। গান্ধী রাজী হোলেন না। ২৮শে জানুয়ারি রাত্রে রাজকুমারী অমৃত কাউর (ইনি তখন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী) যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপু, আজ আপনার প্রার্থনাসভায় কোনো গোলমাল হয়েছিল?"—তখন তার উত্তরে গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন—"তোমার প্রশ্ন শুনে মনে হয় তুমি আমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। যদি কোনো উন্মাদের গুলির আঘাতে আমার মৃত্যু হয়, আমি হাসতে হাসতেই মরব। আমার মধ্যে কোনো ক্ষোভ বা বিদ্বেষ

থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর আমার অন্তঃকরণে ও ঠোঁটে নিশ্চয়ই বিরাজ করবেন।”

হায়, তখন কে জানত যে, এই উক্তির আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি গুলির আঘাতেই মারা যাবেন। তাঁর জীবনের শেষের কয়েকদিন গান্ধী একটি বিষয়ের জন্য দারুণ উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। সেটা হোল প্যাটেল ও নেহরু—এই দুজনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্যের হেতু মুসলমান। পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখের হত্যাকাণ্ডে প্যাটেল যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে গান্ধী ও নেহরুর মনোভাব দেখে তিনি রীতিমতো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এঁদের মুসলিমতোষণ নীতি তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। এই সময় দিল্লীর এক জনসভায় প্যাটেল সোজাসুজি বলেছিলেন যে, “যদি ভারতের মুসলমানগণ ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য না প্রদর্শন করে, তবে কিছুতেই তাদের বিশ্বাস করা চলবে না।”

জানুয়ারি ৩০। ১৯৪৮।

ঐদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় যাওয়ার আগে গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের শেষবারের মতোন দেখা হয়। কথা ছিল তিনি প্রার্থনাসভা থেকে ফিরলে প্যাটেল ও আজাদ গান্ধীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবেন। বিড়লাভবন থেকে বেরিয়ে গান্ধী চলেছেন প্রার্থনাসভার দিকে। লনের ওপর দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন—তাঁর হাত দুটি তাঁর দুই নাতনী মানু ও আভা গান্ধীর কাঁধের ওপর ন্যস্ত। প্রার্থনাসভার প্রায় কাছাকাছি যখন তাঁরা পৌঁছেছেন তখন হঠাৎ দেখা গেল জনতার মধ্যে থেকে একটি যুবক দৌড়ে এসে গান্ধীকে করজোড়ে অভিবাদন করল। যুবকটির আকৃতি দীর্ঘ নয়, তবে সে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। তার কণ্ঠে শোনা গেল মাত্র একটি কথা—

নমস্তে। তারপর সে আনত হোয়ে গান্ধীর পা স্পর্শ করতে উদ্যত হোল।

"নমস্তে", প্রতি অভিবাদন করলেন গান্ধী করজোড়ে।

চকিতে যুবকটি তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করল একটি রিভলভার এবং পর পর তিনটি গুলি ছুঁড়ল গান্ধীর শরীর লক্ষ্য করে। দুটি গুলি তাঁর বুক বিদ্ধ করল এবং তৃতীয়টি পেটের তলদেশ। গুলির আঘাতে বৃদ্ধ গান্ধীর শরীর একটু দুলে উঠল। তখনো তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে। তারপর তাঁর সংজ্ঞাশূন্য রক্তাক্ত শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পড়বার সময় তাঁর মুখে শুধু শোনা গেল একটি কথা—হা রাম! ক্রমে চোখ দুটি বুঁজে এলো, মুখখানি হয়ে উঠল ধূসর। তাঁর পরণের শাদা ধবধবে খদ্দরের কটিবস্ত্রখানি তখন রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে।

সেই অবস্থায় তাঁকে তুলে নিয়ে আসা হোল ঘরের মধ্যে। কিন্তু তখন তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল তিন মূর্তি মার্গে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে বসে এই সংবাদ পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিড়লাভবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর মনের গতি তখন নিস্তব্ধ, তাঁর পৃথিবী তখন অন্ধকার। এত বড়ো একটা শোচনীয় ঘটনা যে জাতির জীবনে স্বাধীনতালাভের এত অল্পদিনের মধ্যেই ঘটবে—এ ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। আততায়ীর গুলিতে গান্ধী নিহত হতে পারেন—এমন কথা তিনি কোনোদিন ভাবতেও পারেন নি।

কিন্তু যা ভাবা যায় না, তাইতো সংসারে ঘটে থাকে।

তবে যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও হানাহানির ফলে রুধিরাক্ত পথ দিয়ে খণ্ডিত ভারতে সেদিন স্বাধীনতা এসেছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও যখন দেখা গেল যে, দেশ শান্ত হোল না, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বিষবাষ্প তখনো মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে,

তখনি অনেকের মনে এইরকম একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা জেগেছিল। ২০শে জানুয়ারি মদনলালের বোমা নিক্ষেপের মধ্যেই যেন ভাবী ঘটনার একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

গান্ধী নিহত হোলেন।

ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের চিত্ত যিনি জয় করেছিলেন, জাতির সেই সর্বজনপ্রিয় নেতা একজন আততায়ীর গুলির আঘাতে নিহত হোলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার পর পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড়ো শোচনীয় ঘটনা আর ঘটেনি। বিড়লাভবনের দিকে গাড়ি করে যেতে যেতে জওহরলাল কি তখন এইসব কথাই চিন্তা করছিলেন? তিনি কি ভাবছিলেন—বাপুর কথাই কি সত্য হোল—তাঁর মৃতদেহের ওপর ভারত বিভক্ত হোল? অথবা ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু—এমন শোচনীয় ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু এই কথাই প্রমাণ করে দিল যে, ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরো মৃত্যু হয়েছিল; আততায়ীর গুলির আঘাতটা উপলক্ষ্য মাত্র।

নেহরুর গাড়ি এসে থামল বিড়লাভবনের সামনে।

রাজধানীতে মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সেই দুঃসংবাদ—আততায়ীর গুলিতে গান্ধীর দেহ বিদ্ধ হয়েছে। কাতারে কাতারে জনতা ভেঙে পড়ল বিড়লাভবনে। অধীর আগ্রহের রেখা তাদের মুখে—গান্ধী কি সত্যিই মারা গেছেন? নেহরু এসে দেখলেন মেঝেতে একটি গদীর ওপর শায়িত বাপুর দেহ। এইখানে বসেই প্রতিদিন তিনি কাজ করতেন। সেই গদীর ওপর আজ অন্তিম শয়নে শায়িত গান্ধী—তাঁর মাথাটি ফুলের বালিশের ওপর সযত্নে ন্যস্ত। তাঁর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে কি গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছিল। এমন বেদনাময় ও মর্মন্তুদ দৃশ্য যে কোনোদিন তাঁকে চাক্ষুষ করতে হবে, নেহরু তা কখনো কল্পনা করেন নি।

হাঁটু গেড়ে তাঁর মৃত নেতার পাশে বসলেন নেহরু।

শিশুর মতোন দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেন মহাত্মার নিস্পন্দ হাত দুখানি। নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না তিনি। তাঁর দুই চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারে নেমে আসে অশ্রু। অসহায়ের মতোন কাঁদতে লাগলেন তিনি—সে কান্না থামতে চায় না; মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসে স্পন্দিত হয় নেহরুর শোকার্ত শরীর। বিষণ্ণ মনে ওঠে বেদনার তরঙ্গ।

প্যাটেলও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন।

নেহরুর মতোন তিনিও শোকার্ত—বিষণ্ণ। কিন্তু শোকে তিনি তাঁর মতোন ভেঙে পড়লেন না। ধূপধূনার সুরভিতে ভরে উঠেছে ঘরটি। গদীর ওপর শায়িত মহাত্মার প্রাণহীন দেহটিকে ঘিরে পুরমহিলারা শোকগম্ভীর কণ্ঠে অনবরত উচ্চারণ করে চলেছে—রাম! রাম! আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ হওয়ার সময় গান্ধীর কণ্ঠ থেকেও নির্গত হয়েছিল এই একটি কথা—হা রাম!

এই দুঃসংবাদ শোনা মাত্র ত্রস্তপদে এলেন মাউণ্টব্যাটেন।

নেহরুর নিরাপত্তার চিন্তাই তাঁর মনকে তখন আচ্ছন্ন করেছে, কেন না তিনি জানতেন নেহরুও ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে গান্ধীর অনুরূপ ভাবই পোষণ করতেন—সেই রকম উদার এবং সহৃদয়তাপূর্ণ মনোভাব। তিনি আরো জানতেন নেহরুর জীবনের আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছিল। প্যাটেল ও নেহরুর মধ্যে দারুণ মতদ্বৈধের কথাও তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। গান্ধীর মৃতদেহের পার্শ্বে সমবেত দুজনকে দেখে তিনি সময়োচিত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, "গান্ধীজীর সঙ্গে আমার যখন শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন তিনি আমার কাছে তাঁর মনের সবচেয়ে প্রিয়তম ইচ্ছাটি ব্যক্ত করেছিলেন—বলেছিলেন আপনারা দুজনে যেন সম্পূর্ণভাবে মিলেমিশে দেশশাসনের কাজ করেন।"

মাউন্টব্যাটেনের মুখে এই কথা শুনে নেহরু ও প্যাটেল দুজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন এবং তারপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শুভ্র খদ্দরে পরিবৃত ও মেঝের ওপর শায়িত গান্ধীর প্রাণহীন দেহের প্রতি। তাঁরা পরস্পরের কাছে একটু এগিয়ে এলেন এবং মিলনের ভঙ্গীতে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হোলেন।

বিড়লা ভবনের বাইরে তখন বিশাল জনতা।

গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়া উচিত।

নেহরু বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফটকের ওপরে হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি মুহূর্তমধ্যে নিবদ্ধ হয় তাঁর ওপর। ফটকের এধারে দাঁড়িয়ে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি শুধু বললেন—"মহাত্মা আর নেই।" তারপর একটু সংযত হয়ে বললেন—"আজীবন তিনি যে আদর্শের জন্য সাধনা করেছেন এবং যেজন্য তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন, আমরা যদি মনে-প্রাণে সেই আদর্শের অনুসরণ করতে পারি, তবেই বাপুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সার্থক হবে।"

জনতা শান্তভাবে শুনল সেই কথা। তাদের সেই শান্ত ও নিস্তব্ধভাব দেখে মনে হোল তারা নেহরুর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যকে জানাল তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

ঠিক হোল আকাশবাণী মারফৎ নেহরু ও প্যাটেল শোকাহত জাতির উদ্দেশে তাঁদের বক্তব্য শোনাবেন। সেদিন নেহরু যেভাবে যা বলেছিলেন তা ছিল তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত কথা, তৈরি করে কিংবা ভেবেচিন্তে অথবা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা জিনিস নয়। তাই তাঁর সেদিনকার বেতারভাষণ জাতির চিত্তকে গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল। প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি জাতির উদ্দেশে আকাশবাণী মারফৎ যে কয়টি ভাষণ দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে সেই ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি রাত্রিতে দেওয়া ভাষণটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপূর্ব ইংরেজিতে কথিত এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Our beloved leader, Bapu as we called him, is no more.... The light that shone in this country was no ordinary light. The light that has illumined this country for these many years, will illumine this country for many more years, and a thousand years later, the light will be seen in this country and the world will see it and it will give solace to innumerable hearts."

সত্যিই আলো নিভে গেল।

ভারত হোল শোকাভিভূত।

পরের দিন জাতীয় উপবাস ও প্রার্থনার দিন বলে ঘোষিত হোল। যমুনার তীরে সাতলক্ষ জনতার সামনে গান্ধীর মরদেহ ভস্মীভূত হোল। চন্দনকাঠের চিতার ওপর শায়িত নেতার প্রতি নেহরু শেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন—তিনি চিতার পার্শ্বে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পদচুম্বন করলেন। দেবীদাস গান্ধী পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। চিতা জ্বলে উঠল। চিতাগ্নির সেই লাল ও সোনালী রঙে দিল্লীর সান্ধ্য আকাশ রাঙিয়ে উঠল। নিমীলিত নয়নে নেহরু দেখলেন, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মরদেহ সেই চিতাগ্নিতে ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জনতার রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত হোল শুধু একটি কথা "অমর হো গ্যায়"—গান্ধী অমরত্ব লাভ করলেন।

পরের দিন। সকালবেলা।

নেহরু এলেন রাজঘাটে।

তখনো চিতার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে দগ্ধকাষ্ঠ ও ভস্মরাশি।

নেহরুর সে প্রদীপ্ত মুখ আর নেই—প্রচণ্ড শোকের আঘাতে একরাত্রির মধ্যেই যৌবনোদ্ভাসিত সেই মুখখানি যেন হয়ে উঠেছে

মলিন ও বিবর্ণ আর রেখাবহুল। বিষণ্ণতার ছাপ মুখের প্রতিটি রেখায় সুস্পষ্ট। হাতে করে ফুল নিয়ে এসেছিলেন নেহরু। চিতাবশেষের পাশে ধীরে ধীরে তিনি সেই ফুলগুলি রাখলেন।

"ফুল এনেছি, বাপুজি। আজ অন্ততঃ আপনার অস্থি ও ভস্মাবশেষের উদ্দেশে আমি এই ফুল নিবেদন করতে পারি। আগামী কাল কোথায় আমি এ ফুল রাখব, আর কাকেই বা দেব।"

জীবনে আজ সত্যিকার নিঃসঙ্গ বোধ করলেন নিজেকে নেহরু।

আজ তিনি সত্যিই নিজেকে পিতৃহীন মনে করলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: "গান্ধীজির মৃত্যুতে আজ একটি যুগের অবসান হোল। তাঁর প্রিয় আদর্শের অনুসরণ ভিন্ন কেবলমাত্র শোক প্রকাশ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যাবে না।"

১৬

স্বাধীনতালাভের পর দু'বছর তিনমাস ধরে চলল গণ-পরিষদের অধিবেশন। ১৯৪৯, ২৬শে নভেম্বর। গণ-পরিষদ রচনা করলেন স্বাধীন ভারতের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র। ১৯৫০, ২৬শে জানুয়ারি প্রবর্তিত হোল এই শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হোল। প্রথম সাধারণ নির্বাচন হোল ১৯৫১ সনে। স্বাধীনভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি আর প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হোলেন যথাক্রমে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীজওহরলাল নেহরু।

১৯৪৭ থেকে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে গান্ধীহত্যা ভিন্ন আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলির একে একে যোগদান। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কেবলমাত্র জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর—এই তিনটি রাজ্য ভিন্ন, প্যাটেলের নেতৃত্বে ও তাঁর জীবিতকালে এই কঠিন কাজটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়। অত তাড়াতাড়ি যে ভারতের মানচিত্র থেকে এদের অস্তিত্ব মুছে যাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি সেদিন। ভারতের 'লৌহমানব' প্যাটেলের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে তাঁর এই কৃতিত্ব স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক মোরেস লিখিত জওহরলাল নেহরুর জীবনচরিতে এই মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"Within a year of independence India from a conglomeration of some six hundred units, comprising numerous provinces and princely States, became a compact area of twenty-six States. The primary credit for this prodigious performance must go to Vallabhbhai Patel."

১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসে প্যাটেলের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দেশশাসন ব্যাপারে এবং কংগ্রেস পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। "With Patel's death Nehru was freed from many mental inhibitions and some administrative and party restraints." মোরেসের এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তথাপি গান্ধীর মৃত্যুর পর, যতদূর সম্ভব, নেহরু ও প্যাটেল একযোগে দেশশাসনের কাজ চালিয়েছেন এবং দুজনের মধ্যে আদর্শগত প্রবল মতভেদ সত্ত্বেও, নেহরু, ভারতের কল্যাণের স্বার্থে, যতদূর সম্ভব তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী প্যাটেলের হাতে হাত মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। একমাত্র গান্ধীর স্মৃতিই তাঁকে এই বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছিল, এ কথা নেহরু নিজেই স্বীকার করেছেন। "The memory of Gandhiji keeps us together—" এই কথা তিনি বলেছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক এডগার স্নোকে।

১৯৪৯।

নেহরুর জীবনে ষাট বছর পূর্ণ হোল।

জাতির পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দেওয়া হোল 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থ।'

এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। দেশ-বিদেশের মনীষীদের রচিত শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে নেহরুর জীবনের

ষাট বছরের কর্মকৃতির কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

১৯৫০ সন থেকে ভারত শাসন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরুর কাজের বিরাম ছিল না। তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভারতকে একটি প্রকৃত জনকল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর চিন্তা ও কাজের অন্ত ছিল না বললেই হয়। কত সমস্যার ভেতর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল দেশের ভিতরে ঐক্য এবং সংহতির জন্য। তাঁকে যেমন সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়েছিল, তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিনি তো শুধু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপর। কত ধীর এবং স্থির মস্তিষ্কে তিনি এই দপ্তরের জটিল কাজ পরিচালনা করতেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর বৈদেশিক নীতির সম্যক আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে পাই যে, ঘরে-বাইরে কত প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করে তিনি একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই নীতিকে আশ্রয় করেই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সত্যিই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে।

১৯৫১। ২২শে নভেম্বর।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

সারাদেশে সে কী উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

নেহরুর বয়স তখন একষট্টি বছর। সেই বয়সে যৌবনোচিত উৎসাহ নিয়ে তিনি নির্বাচনী সফরে বেরুলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। পায়ে হেঁটে, মোটর ও রেলে চড়ে এবং এরোপ্লেনে তিনি

প্রায় ৭০ হাজার মাইল পথ এই সময়ে অশ্রান্তভাবে ঘুরেছিলেন। সর্বত্রই জনতা তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য উৎসুক থাকত। কথিত আছে, এইসময়ে একমাত্র কেরল রাজ্যে নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের পর্যুদস্ত করার জন্য দুইদিনে তিনি ছিয়াত্তরটি বক্তৃতা করেছিলেন। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ হোল। রাজ্যসভায় ৩৯৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস অধিকার করল ৩৬৪টি আসন আর বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপরিষদে ২,২০০-র অধিক আসন অধিকার করল। দেশের সর্বত্র স্থাপিত হোল কংগ্রেস শাসন।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যের নিদর্শন। সেদিন স্বাধীনভারতে এই গণতন্ত্রের পতাকা বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছিলেন একা নেহরু। স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছর পরে দেখা গেল যে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে ঐক্য এবং সংহতির পথে চলেছে। এইবার নেহরু কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State) গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে কল্যাণরাষ্ট্র গঠন তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন। ১৯২৭ থেকে তিনি মনের মধ্যে এই ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন। প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা। ১৯৫০-এর মার্চ মাসে ভারত সরকার এই কমিশন নিযুক্ত করেন এবং এই কমিশন ১৯৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করেন। নেহরু স্বয়ং এই পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করা হয় তখন বেতারে জাতির উদ্দেশে নেহরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন: "Our economy and social structure have outlived their day, and it has become a matter

of urgent necessity for us to refashion them so that they may promote the happiness of all our people in things material and spiritual. We have to aim deliberately at a social philosophy which seeks a fundamental transformation of this structure, at a society which is not dominated by the urge for private profit and by individual greed and in which there is a fair distribution of political and economic power."

নেহরু-নির্দিষ্ট এই নীতি অনুসারে ভারতের সমাজজীবন, এর অর্থ-নৈতিক কাঠামো নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে আমরা চলে এসেছি এবং এর ফলে ভারতের সমাজজীবনে ও অর্থনৈতিক জীবনে কী অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে, সে কাহিনী সুবিদিত। দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করার জন্য কত রকমের পরিকল্পনা একটির পর একটি গ্রহণ করা হয়েছে, সে কথা সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা আছে। দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র আজ তাই বদলে গেছে। শিল্পোন্নয়নের পথে ভারতের বর্তমান অগ্রগতি আজ শিল্পে অগ্রসর পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা এতকাল ছিল অবরুদ্ধ, আজ তাই শতপথে উচ্ছলিত বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পরিকল্পনার দৌলতে ভারত এখন শিল্প-সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগমনের প্রেরণা দিয়ে গেছেন নেহরু।

ভূমি-সংস্কার, কম্যুনিটি ডেভলেপমেণ্ট, শিক্ষার বিস্তার, শিল্পের বিস্তার, এইভাবে স্বাধীন ভারতের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের জন্য নেহরু চিন্তা করেছেন যত, কাজ করেছেন তত বেশি। পৃথিবীর চারদিকে

চলেছে জাগরণ, চলেছে উন্নতি। একে অন্যের সহায়তায় অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না—এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন নেহরু। তাইতো দেশ-বিদেশের মূলধন আর কারিগরী অভিজ্ঞতার সহায়তায় তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর বৈদেশিক নীতিও এই একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, বলা চলে। ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে গণ-পরিষদে তিনি তাই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"Whatever policy you may lay down, the art of conducting the foreign affairs of a country lies in finding out what is most advantageous to the country. We may talk about peace and freedom and earnestly mean what we say. But in the ultimate analysis a government functions for the good of the country it governs"

"For the good of the country" অর্থাৎ দেশের কল্যাণে, দেশের স্বার্থে—এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যে আমরা মানবদরদী যে জওহরলালকে পাই, সেই তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে এশিয়ার মধ্যে সর্ববিষয়ে ভারতকে উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য কত না চিন্তা করতেন। নবভারতের রূপকার হিসেবে ইতিহাস একদিন তাঁর স্থান নির্দেশ করবে। ১৯২৮ সনে ওয়ার্ধা থেকে এক পত্রে গান্ধী জওহরলালকে লিখেছিলেন ঃ "ভগবান তোমায় দীর্ঘ পরমায়ু দিন, দাসত্বের শিকল থেকে ভারতের মুক্তির জন্য তিনি যেন তোমাকেই তাঁর দূত নির্দিষ্ট করেন।" দীর্ঘ পরমায়ু তিনি লাভ করেছিলেন এবং তিনি কেবলমাত্র অন্যতম মুক্তির দূত ছিলেন না, তিনিই ছিলেন স্বাধীন ভারতের সর্ববিধ সমৃদ্ধির নির্মাতা।

প্রধানমন্ত্রীরূপে জওহরলাল ভারতকে সকল বিষয়ে কতদূর অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গৌরবকে কতখানি তুলে ধরেছিলেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস ভবিষ্যতে একদিন বিরচিত হবে।

দীর্ঘ সতেরো বছর কাল ভারতরাষ্ট্র তরণীর হাল বলিষ্ঠ হাতে ধরে রেখেছিলেন জওহরলাল। তাঁর এই সতেরো বছরকালের জীবন নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ—পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র তাঁকে সসম্মানে তাদের দেশে আহ্বান করে নিয়ে গেছে, সর্বত্র তিনি বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছেন। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর বাণী তিনি সর্বত্র প্রচার করতেন। আণবিক যুগে ভাবী যুদ্ধের বিভীষিকায় পৃথিবী যখন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তখন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের এক অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার ফলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়েছিল।

২৭শে মে, বুধবার। ১৯৬৪

সমস্ত ভারতবর্ষ সচকিত হয়ে শুনল যে তাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আর নেই। তারে ও বেতারে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। শোকার্ত হয়ে উঠল সারা পৃথিবী এই একটি মানুষের মৃত্যুতে। এমন মৃত্যু খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটেছে। সেদিন বেতারে প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন: "Jawaharlal Nehru was one of the greatest figures of our generation, an outstanding statesman whose services to the cause of human freedom are unforgettable. As a fighter for freedom he was illustrious, as a maker of modern India his services were unparalleled···An

epoch in our country's history has come to a close."

রাষ্ট্রপতির এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তাঁর মৃত্যুতে সত্যিই একটি যুগের অবসান হয়েছে যেমন একদিন হয়েছিল গান্ধীর মৃত্যুতে। রাষ্ট্রপতি পরে আরো বলেছিলেন: "নেহরু সম্পর্কে বড়ো কথা হোল এই যে, তিনি জনগণের জীবনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন এবং তাদের জীবন সমৃদ্ধতর ও পূর্ণতর করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।"

এ কথাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

২৮শে মে, বৃহস্পতিবারের রক্ত-সন্ধ্যায় অস্তরশ্মির সঙ্গে যখন নেহরুর চিতার রশ্মি মিলেছিল, পরে চিতাভস্মরাশি যখন যমুনার নীল জলে লীন হয়ে গিয়েছিল—তখনো লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ শোকের ঐকতানে সমস্বরে বলে উঠেছিল—"নেহরু অমর রহে।"

শোকার্তজাতির এর চেয়ে বড়ো শ্রদ্ধানিবেদন আর কি হোতে পারে? দিল্লীর রাজঘাটে। যেখানে গান্ধীর সমাধি, জাতির নায়কের অন্তিমশয্যা রচিত হয়েছিল তারই অদূরে লালরঙের পাথরের বেদীতে। আরো একটি যুগাবসানের সাক্ষী হয়ে রইল পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থ, ঐতিহাসিক দিল্লী। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের বেদনামথিত এমন শোকসমুদ্র দিল্লীও কখনো দেখে নি। এমন একটি মহান মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে এমন বিশ্বনেতৃ সমাগম আগে কখনো ঘটে নি। শোকের এমন সার্বজনীন প্রকাশ ইতিহাসেও খুব কম পাওয়া যায়। জীবনে ও মরণে নেহরু প্রমাণ করে গেলেন যে তিনি সত্যিই জননায়ক জওহরলাল।

মৃত্যু আজ নেহরুর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে। এনে দিয়েছে প্রত্যেকের অন্তরে। প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর

জীবনের সাফল্য বা অসাফল্যের কথা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করবেন, আজ আমরা শুধু বহুভঙ্গিম সেই মানুষটির চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তা ও কর্মের ধারা অনুসরণ করতে পারি।

যতবড়ো একজন রাষ্ট্রনেতা তিনি ছিলেন, ঠিক তেমনই প্রতিভাবান একজন লেখক ছিলেন নেহরু। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সাহিত্য-প্রতিভা যেমন বিশ্বের বিদগ্ধজনের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাহিত্য-প্রতিভাও দেশ-বিদেশের মনীষীর অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছে। এই দিক দিয়ে তিনি একজন যথার্থ কৃতী ও খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তাঁর সকল লেখাই ইংরেজিতে। অপূর্ব, সুন্দর ইংরেজি। বিশ্বের দরবারে রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল নেহরু যত পরিচিত সে তুলনায় একজন চিন্তাশীল মনীষী ও শক্তিমান সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে বিদেশী সমাজে তিনি ঢের বেশি পরিচিত। আধুনিককালে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় সার্থক লেখক হিসেবে তিনি তাঁর জীবিতকালেই খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৩৬ সনে যখন নেহরুর আত্মচরিত (Autobiography) প্রকাশিত হয় তখনি তা বিশ্বের বিদগ্ধজনের সমাদর লাভ করে। দীর্ঘ কারাবাসের নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিরচিত হয়েছিল। আত্মচরিত যখন প্রকাশিত হয় তখন নেহরুর বয়স মাত্র সাতচল্লিশ বছর। শৈশব থেকে এইকাল পর্যন্ত তাঁর নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে তিনি এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইহা তাই একান্তভাবেই আত্মচরিত, আধুনিক ভারতের ইতিহাস নয়। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইখানি অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ কালে একমাত্র গান্ধীর আত্মচরিত ভিন্ন আর কোনো ভারত-বাসীর লেখা আত্মচরিত স্বদেশে ও বিদেশে এমন সমাদর লাভ করে নি।

বইখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন বিভিন্নদেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র এর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন। য়ুরোপের কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ বেরিয়েছে। ভারতেও বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। জওহরলালের আত্মজীবনীতে একদিকে আছে তাঁর মানসিক বিকাশের ইতিহাস, তাঁর চিন্তা ও চরিত্রের সংযত ও পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি, তেমনি অন্যদিকে এর মধ্যে আমরা পাই বঞ্চিত ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি আছে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অধ্যায় আর আছে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের কথা। বইখানির প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

আত্মচরিত ভিন্ন পরবর্তীকালে নেহরু আরো অনেক বই রচনা করেন, যথা—*The Discovery of India ; Glimpses of World History ; India and the World ; Letters from a Father to His Daughter ; The Unity of India ; Mahatma Gandhi ; Soviet Russia* প্রভৃতি। এইগুলির মধ্যে 'ভারত আবিষ্কার' এবং 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' এই দুখানি বই পাঠকসমাজে তাঁর আত্মচরিতের তুল্যই সমাদর লাভ করেছিল। এই গ্রন্থদুটির মধ্যে নেহরু শুধু লেখকই নন, একজন ঐতিহাসিকও বটেন। পাতায় পাতায় প্রকট হয়ে উঠেছে তাঁর ইতিহাস-সচেতন মন আর ইতিহাস-দৃষ্টি। সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসকে কেন্দ্র করে যতগুলি গ্রন্থ রচিত হয়ে বিশ্ব-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, নেহরুর 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' বইখানি সেই তালিকায় আজ স্থান পেয়েছে। অতীতের ইতিহাসকে ভিত্তি করে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ও নিরাসক্ত আলোচনায় নেহরু যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা পাঠ করলে বিস্মিত হোতে হয়। এই গ্রন্থখানিতে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও

ইতিহাস বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়, বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করার জিনিস।

'ভারত আবিষ্কার' বইটির মধ্যে আছে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়। এই গ্রন্থে লেখক ভারতের আত্মার সন্ধান করেছেন ; খুঁজেছেন এর নিজস্বতার ভিত্তিকে আর সেইসঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের অখণ্ড বৈশিষ্ট্যকে। ভারতবর্ষের স্বরূপকে তিনি অনুভূতিপ্রখর দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ভারত-চেতনার গতি ও প্রকৃতি বুঝতে হোলে এই গ্রন্থখানি প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত।

তাঁর 'দি ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হোল। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর তাঁর যখন একটু অবসর মিলল তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন ঃ

"হরিপুরা কংগ্রেস তখন শেষ হয়ে গেছে। তাপ্তীর তীরে ইন্দ্রজালের মত যে নগরী গড়ে উঠেছিল তা আজ পরিত্যক্ত। দু' একদিন আগেও পথ ছিল প্রাণস্ফূর্ত জনতায় পরিপূর্ণ, তাদের কেউ গম্ভীর কেউ বা চঞ্চল, হাস্যে আলাপে আলোচনায় মুখর, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তারা গড়ে তুলছে এই বোধ তাদের মনে জাগ্রত। অকস্মাৎ এই সহস্র সহস্র লোক সুদূর গৃহের পথে যাত্রী হয়েছে, নিস্তব্ধ বাতাসে শূন্যতার আভাস। ধূলার ঝড় পর্যন্ত ক্ষান্তবেগ। এখানে এসে অবধি এই আমার প্রথম অবসর ঘটল তাপ্তীর তীরে ঘুরে বেড়াবার ; আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে আমি জলপ্রবাহের একেবারে নিকটে গেলাম। মনে বেদনাবোধ করতে লাগলাম এই কথা ভেবে যে, এই যে মাঠের মধ্যে এক আশ্চর্য শহর ও শিবির গড়ে উঠেছিল শীঘ্রই তা কোথায় মিলিয়ে যাবে, চিহ্নটুকুও রেখে যাবে না—শুধু থাকবে এর স্মৃতি।

"ক্রমশ বেদনা মিলিয়ে গেল। কোনো দূর দেশে চলে যাবার যে

কামনা বহুদিন থেকে মনে জেগে আছে সেই ইচ্ছা একান্তভাবে আমাকে আবিষ্ট করে তুলল। শারীরিক অবসাদ নয় এ, মনের ক্লান্তি, নূতন পরিবেশ ও প্রসন্নতা চায় মন। রাষ্ট্রকর্মে জীবনকে জীর্ণ করে ফেলে, এ আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। দীর্ঘকালের অভ্যাসে আমি এ কাজ করে চলেছি বটে, কিন্তু ক্রমশ এই দৈনন্দিন কাজ আমার পক্ষে বিস্বাদ হয়ে উঠছে—সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছি, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, কিন্তু মন রয়েছে অন্যত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছে উত্তরের পর্বতমালায়, তার তুষারাবৃত শিখরে, গভীর উপত্যকায়, তার পাইন ও দেওদার তরুশ্রেণীতে। চারিদিকে যে সকল সমস্যা ও বাধা আমাদের ঘিরে রয়েছে তাদের হাত থেকে পালাতে চায় মন, পেতে চায় শান্তি, নিস্তব্ধতা, শুনতে চায় বাতাসের মৃদু নিশ্বাসধ্বনি।”

এই গ্রন্থের অন্যত্র আলমোড়ার পার্বত্যপথে ভ্রমণের সময় এর রমণীয় সৌন্দর্য দেখে তিনি বিমুগ্ধচিত্তে লিখেছেন ঃ—“আলমোড়ার পথ অতিবাহিত করতে গিয়ে পাহাড়ের হাওয়া আমাকে যেন মাতিয়ে তুলেছিল। আলমোড়া থেকে আমরা থালিতে যাই। পাহাড়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাত্রা সমাপ্ত করি। দু' বছর ধরে আমি এখানে আসবার কথা ভেবেছি, অবশেষে এখানে আসা গেল, খুব ভাল লাগছে। সূর্য অস্তপ্রায়, পাহাড়ে তার আভা, উপত্যকা নিস্তব্ধ। চোখ খুঁজে মরছে নন্দাদেবী গিরিশিখর দেখবার জন্য, কিন্তু গিরিশ্রেণী মেঘে ঢাকা।

“দিনের পর দিন যায়, বুক ভরে পাহাড়ে বাতাস গ্রহণ করছি, চোখ ভরে তূষার ও উপত্যকার দৃশ্য দেখছি। কি রমণীয় শান্তিময় দৃশ্য—পৃথিবীর যত দুঃখগ্লানি যেন সব মায়া, কোন্ সুদূরে মিলিয়ে গেছে। পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বে গভীর উপত্যকা আমাদের দু'তিন হাজার ফুট নিচে বেঁকে চলে গেছে। উত্তরে নন্দাদেবী ও তার

ধবলশিখর সঙ্গীদল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের কোথাও সোজা অনেক নিচে নেমে গেছে, কোথাও বেঁকে গিয়েছে, সে বঙ্কিম কোমল চক্রাকৃতি—রমণীর বক্ষদেশের সঙ্গে তা তুলনীয়। কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে মানুষের শ্রমদক্ষতার নিদর্শন শ্যামল সমতল ক্ষেত্র। প্রতিদিন প্রভাতে অনাবৃত দেহে আমি খোলা জায়গায় শুয়ে থাকতাম, মধুর সূর্যালোক আমাকে তার উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করত। তীব্র তুষার বায়ুতে শীতার্ত হলে সূর্য আমাকে রক্ষা করেছে তাপে ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ করে দিয়ে।

"কতদিন পাইন গাছের তলায় শুয়ে বাতাসের কণ্ঠধ্বনি শুনেছি, কত বিচিত্র কাহিনী সে আমাকে কানে কানে বলে গিয়েছে, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সুপ্তিনিমগ্ন করে আমার মনের তাপজ্বালা শান্ত করে দিয়ে গেছে। আমার অসতর্ক মুহূর্তে আমাকে বুঝিয়েছে, অর্থহীন পৃথিবীর মানুষের আচরণ, তাদের সমাপ্তিহীন দ্বন্দ্ব, তাদের রাগদ্বেষ, আর ধর্মমূঢ়তা, রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাদের নীচতা, আদর্শচ্যুতি। কি লাভ তাদের মধ্যে ফিরে গিয়ে, তাদের সঙ্গে ব্যবহারে জীবনের শক্তি ক্ষয় করে? শান্তি সুখ সব এইখানেই; তুষার ও পর্বত, গিরিগাত্রের কত বিচিত্র তরুশ্রেণী ও পুষ্পরাজি, গীতমুখর পাখির দল এরাই তো আছে সঙ্গী। মধুর স্বরে কৌশলীর মত এই কথা বাতাস আমাকে শুনিয়ে যেত, বসন্তদিনের মাধুর্যে আবিষ্ট হয়ে আমি শুনেছি তার কথা।

"পাহাড়ে তখনও নব বসন্ত, যদিও সমভূমিতে তখন গ্রীষ্মের সূচনা। পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন-গুচ্ছের উজ্জ্বল রক্তিমা দূর থেকে চোখে পড়ে। সুন্দর সেই দৃশ্য—এর মহিমায় অভিভূত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তাকিয়ে থেকেছি। ভারতবর্ষের সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, কত দূর দেশে গিয়েছি কিন্তু আমারই নিজ প্রদেশের এক প্রান্তে যে অপূর্ব সুন্দর স্থান রয়ে গেছে এতদিন ধরে তা লক্ষ্য করিনি,

এ কথা ভেবে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছি। ভারতবর্ষের কজন লোক এ দৃশ্য দেখেছে বা এর কথা শুনেছে?”

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে এবং পরবর্তীকালে দেশশাসনের দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে যদি নেহরুর সমগ্র জীবন না কাটত, তা’ হোলে, আমার ধারণা, তাঁর মধ্যে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে আরো বেশি করে পেতাম। রাষ্ট্রনেতা নেহরুর কথা যদি বা আমরা কোনোদিন বিস্মৃত হই, লেখক নেহরুকে অথবা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন।

নবীন ভারতের ঋতুরাজ জওহরলাল।

১৯৩৬ সনে রবীন্দ্রনাথ জওহরলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

“তরুণ ভারতের হৃদয় সিংহাসনে জওহরলালের অকুণ্ঠিত অধিকার। মহিমান্বিত তাঁর চরিত্র, দুর্ধর্ষ তাঁর সংকল্প, অপরাজেয় তাঁর বীর্য; সর্বোপরি তাঁর চরিত্র ও মননের অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার দ্বারা সাধারণ মানুষের বহু উর্ধ্বে তিনি নিজ আসন গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের দিনে যখন প্রবঞ্চনা প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যেও তিনি বিভ্রান্ত হন নি, সত্যের পতাকাকে সবলে তুলে ধরেছেন—বিপদের ভয়ে তিনি সত্যকে কোনোদিন গোপন করেন নি, আরামের পথ বলে অসত্যকে আশ্রয় করেন নি। রাষ্ট্রিক চাতুরির হীন প্রণালীতে সুলভ সার্থকতার পথ তাঁর নয়, সুতীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে তিনি বারে বারেই সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। সত্যের প্রতি আদর্শের প্রতি একান্ত গভীর নিষ্ঠাই স্বাধীনতার সংগ্রামে জওহরলালের শ্রেষ্ঠ দান।

আজ দোলযাত্রা, বসন্ত উৎসব; চারিদিকে ঝরা-পাতার মধ্যেই প্রকৃতিতে নবীন প্রাণের উৎসব-আয়োজন, গাছে গাছে নূতন পত্রসম্ভারে সেই উৎসবেরই আনন্দ অর্ঘ্য। প্রকৃতির এই নবজীবন-সঞ্চারের মধ্যে আমি যেন দেশেরই নূতন প্রাণের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি; আনন্দোচ্ছল নবযৌবন মূর্তি জওহরলাল, স্বাধীনতার সংগ্রামে যিনি

অবিচল, অন্যায়কে আঘাত করতে যিনি অপরাঙ্মুখ তিনি এই প্রাণোৎসবের অধিদেবতা ঋতুরাজ।”

নেহরুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ অনেকখানি সক্রিয় ছিল। রাজনৈতিক জীবনে তিনি যেমন গান্ধীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর ওপর স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব এসে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ মূর্ত হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর মধ্যে। তাঁর মৃত্যুর পর কবির স্মৃতিপূত এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরু বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন পাস করিয়ে এর স্থায়িত্ব বিধান করে নিয়েছেন। দেশবাসী তাঁর নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করতেন তা অভিব্যক্ত হয়েছে নেহরুর ‘ভারত আবিষ্কার’ গ্রন্থে উল্লিখিত সুন্দর এই উক্তিটির মধ্যে: “ভারতের জাতীয়তাকে যদি কেউ প্রশস্ততর ভিত্তির উপর স্থাপন করে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপনে তিনি ছিলেন ভারতের অগ্রদূত। সর্বজাতির সহযোগিতা সাধনে তিনি ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন দূর দেশ দেশান্তরে, বিদেশের মৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন স্বদেশের অঙ্গনে।”

কবির “জনগণমন অধিনায়ক” গানটিকে যে ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এর পিছনে ছিল নেহরুর ঐকান্তিক আগ্রহ। ইহা তাঁর রবীন্দ্র-ভক্তির নিদর্শন। মোট কথা, নেহরুর ওপর রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাব তাঁর জীবনের নানা অধ্যায়ের মধ্যে আলোকপাত করেছে। তিনি বার বার শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কবির নিবিড় স্নেহের পরিবেশে নিজেকে স্নিগ্ধ করেছেন, শেষবার এসে তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি এবং মৌনতা দিয়ে শান্তিনিকেতনের মাটি এবং মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। নেহরু-সত্তার মধ্যে

রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মহামানবের চিন্তার প্রত্যক্ষ সমাবেশ জওহরলালের জীবনে ঘটেছিল বলেই না তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অমন সুন্দরভাবে, পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

নেহরুর কর্মময় জীবনের কথা গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে তিনি যতখানি ভারতের ঠিক ততখানি পৃথিবীর। তিনি যেমন আমাদের আপন-জন, তেমনি তিনি পৃথিবীর মানুষের নিকট আত্মীয়। আমরা দেখেছি ভারতের প্রধান-মন্ত্রীরূপে পৃথিবীর যখন যেদেশে তিনি গিয়েছেন, তখনি সেখানকার মানুষ জনসমুদ্রের মতোন তাঁকে বেষ্টন করে ধরেছে। সত্যিই, সব দেশেরই তিনি আপন-জন বলে নন্দিত ও বন্দিত হয়েছেন। পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রনেতাই এমন সৌভাগ্যের দাবী করতে পারেন। তার কারণ নিজের দেশের যেমন, তেমনি সারা পৃথিবীরই তিনি কল্যাণ কামনা করেছেন।

ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসেছেন।

ভারতের কল্যাণ তিনি চেয়েছেন।

ভারতবাসীর ভালবাসা তিনি পেয়েছেন।

এরই মধ্যে অমর হয়ে রইলেন ভারতরত্ন জওহরলাল।

মৃত্যুর দশবছর আগে তিনি লিখেছিলেন ঃ "It is enough for me that I have exhausted myself, my strength and energy, in India's task।" দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল তিনি দেশকে ভালবেসেছেন। এ ভালবাসা কথার কথা ছিল না। দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজের যাবতীয় শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য নেহরু ভারতের বেদীমূলে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। আমরা যেন সেই জীবনের মহিমা জীবন দিয়ে অনুভব করি।

॥ পরিশিষ্ট ॥

১

॥ জওহরলালের জীবনপঞ্জী ॥

১৮৮৯—১৪ই নভেম্বর জন্ম। জন্মস্থান—এলাহাবাদ। পিতা—মতিলাল নেহরু। মাতা—স্বরূপরাণী নেহরু।

১৯০০—ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জন্ম।

১৯০৫—উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা।

১৯০৭—ভগ্নী কৃষ্ণাহাতী সিংয়ের জন্ম। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান।

১৯১০—প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ।

১৯১২—শিক্ষা সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৬—কমলা দেবীর সহিত বিবাহ। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান। গান্ধীজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৭—কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম।

১৯১৮—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২২—প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও কারাবরণ। আগস্ট মাসে মুক্তি লাভ এবং অক্টোবর মাসে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও পুনর্বার গ্রেপ্তার বরণ।

১৯২৩—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্বাচিত। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তারবরণ।

১৯২৭—মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী পেশ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯—কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩০—লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ও ছয় মাস কারাবরণ।

১৯৩১—পিতৃবিয়োগ।

১৯৩২—উত্তরপ্রদেশের ভূমি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তারবরণ এবং দু' বছর কারাবরণ।

১৯৩৪—কলিকাতায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্যে দুই বছর কারাদণ্ড।

১৯৩৬—পত্নী বিয়োগ। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৭—মাতৃবিয়োগ। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োগ।

১৯৪০—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ।

১৯৪১—জেলের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই মুক্তিলাভ।

১৯৪২—বিখ্যাত আগস্ট বিপ্লব সুরু হওয়ার প্রাক্কালে কারাবরণ। কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহ।

১৯৪৪—ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের মৃত্যু।

১৯৪৫—তিন বছর পরে বন্দিত্ব থেকে মুক্তিলাভ। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচার। শ্রীনেহরুর সওয়াল।

১৯৪৬—চতুর্থ বারের জন্য নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। দিল্লীতে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান।

১৯৪৭—নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মেলন আহ্বান। ভারত বিভাগ। বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ।

১৯৫০—পাক-ভারত বিরোধ অবসানের উদ্দেশে করাচী যাত্রা। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।

১৯৫১—নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের নয়াদিল্লী অধিবেশন। সভাপতির ভাষণ দান।

১৯৫৩—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা।

১৯৫৪—পঞ্জাবে ভাকরা-লাঙ্গাল খালের উদ্বোধন। ডাক-টিকিট শত বার্ষিকী উদ্বোধন। চীনযাত্রা। পথে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নেহরু ও চৌ-এন-লাই যুক্ত বিবৃতি। পঞ্চশীলের ঘোষণা।

১৯৫৫—ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্রের

সম্মেলন। নেহরুর অংশগ্রহণ ও ভাষণ। সোভিয়েট দেশ যাত্রা ও পূর্ব ইউরোপ সফর। নয়াদিল্লীতে নেহরু কর্তৃক ক্রুশ্চেফ ও বুলগানিনের সংবর্ধনা। "ভারত রত্ন" সম্মানলাভ।

১৯৫৬—লোকসভায় নেহরু কর্তৃক ব্রিটেন ও ফরাসীর সুয়েজ খাল আক্রমণের তীব্র নিন্দা।

১৯৫৭—দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে শ্রীনেহরুর মন্ত্রিসভা গঠন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী উৎসবে শ্রীনেহরুর ভাষণ। দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ও মাইথন বাঁধ উদ্বোধন।

১৯৫৮—নয়াদিল্লীতে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। দিল্লীতে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেণ্ডারেস ও শ্রীনেহরু সাক্ষাৎকার। দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূনের সঙ্গে আলোচনা ও সীমান্ত বিষয়ক যুক্ত ইস্তাহার।

১৯৫৯—তিব্বতের দালাই লামার ভারত প্রবেশ। নেহরু কর্তৃক ভারতে আশ্রয় দানের কথা ঘোষণা। চীন সরকার ম্যাকম্যাহন লাইনকে ভারত-চীন আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মেনে নিতে রাজি নন বলে নেহরুজীর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রীর পত্র।

১৯৬০—মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণ। দিল্লীতে নেহরুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। লণ্ডন যাত্রা। কায়রোতে নেহরু-নাসের আলোচনা। নেহরুর পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ। সিন্ধু নদের জলচুক্তিতে স্বাক্ষর-দান। রাষ্ট্রসভার সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ। জামাতা ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু। ভারত এখনও তার আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পায়নি বলে রায়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা।

১৯৬০-৬১—কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা। বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সফর।

১৯৬২—তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর তৃতীয় বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আকস্মিক অসুস্থতা, রোগমুক্তির পর বিশ্রাম নিতে কাশ্মীর যাত্রা। কলম্বো

যাত্রা, চীনকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের কড়া হুকুম। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা। চীনের ভারত আক্রমণ, নেহরুর নূতন ভূমিকা।

১৯৬৩—কামরাজ পরিকল্পনায় নেহরুর আগ্রহ।

১৯৬৪—ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থতা। দীর্ঘকাল পর নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলন। ২৭শে মে ৭৫ বছর বয়সে নয়াদিল্লীতে মহাপ্রয়াণ।

২

॥ নেহরুর অন্তিম ইচ্ছাপত্র ॥

আমি ভারতের জনগণের স্নেহ ও ভালবাসা এত বিপুল পরিমাণে লাভ করেছি যে, তার তিলমাত্র অংশও পরিশোধ করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে স্নেহ-ভালবাসার মত অমূল্য সম্পদের কোন প্রতিদান নেই। অনেকে সম্মান লাভ করেছেন, অনেকে শ্রদ্ধালাভ করেছেন, কিন্তু ভারতের সকল শ্রেণীর নর-নারীর এত অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা আমি লাভ করেছি যে, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি এইটুকুমাত্র আশা করি যে, জীবনের শেষ কয় বৎসর আমি যেন আমার দেশবাসীর ও তাদের স্নেহ-ভালবাসার অযোগ্য না হই।

আমার অগণিত সহকর্মীদের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা একটা বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার সহযোগী কর্মী এবং সেই পথের অনিবার্য দুঃখ ও জয়ের আনন্দ সমানভাবেই ভোগ করেছি।

আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলছি যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্য যেন কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা না হয়। এরূপ আচার অনুষ্ঠানে আমার বিশ্বাস নেই। নিছক অনুষ্ঠানের খাতিরেও আমার পক্ষে ইহা মেনে নেওয়া ভণ্ডামি এবং আত্ম-বঞ্চনার সমান হবে।

পরিশিষ্ট

আমার ইচ্ছা, আমার মৃত্যুর পরে আমার দেহ যেন ভস্মীভূত করা হয়। বিদেশে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবে সেখানেই যেন আমার দেহ ভস্মীভূত করা হয় ও পরে সেই ভস্ম যেন এলাহাবাদে আনা হয়। এই ভস্মের কিছুটা গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। বাকী অংশের ব্যবস্থা নিম্নোক্ত উপায়ে করতে হবে।

আমার চিতাভস্মের কিছুটা এলাহাবাদের গঙ্গায় বিসর্জন দিবার এই ইচ্ছার পিছনে আমার কোনও ধর্মীয় প্রেরণা নেই। এই ব্যাপারে আমার কোনও ধর্মবোধ নেই। শিশুকাল হতেই এলাহাবাদের গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার রূপান্তর লক্ষ্য করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যুগ যুগ ধরে এই দুই নদীর সঙ্গে ইতিহাস, উপকথা, ঐতিহ্য, সংগীত ও কাহিনীর শেষ ধারা মিলিত হয়ে তাদেরই অন্তহীন স্রোতের সঙ্গে একাকার হয়েছে অনেক সময়েই আমি তার কথা ভেবেছি। বিশেষ করে গঙ্গা একান্তভাবে ভারতের নদী। দেশবাসীর অন্তরে সে স্থান লাভ করেছে। এই নদীকে ঘিরেই তাদের স্মৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-আনন্দ, জয়-পরাজয়ের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। গঙ্গা ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে রয়েছে। সে চির-প্রবাহী, চির-পরিবর্তনশীল, তবুও আজও সে সেই গঙ্গাই রয়ে গেছে।

গঙ্গার কথায় আমার মনে ভেসে উঠে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ের সুগভীর উপত্যকা—যাদের আমি এত ভালবাসি। আর মনে পড়ে, নিম্নের দিগন্ত-বিশারী উর্বর সমভূমি—যেখানে আমার জীবন ও কর্মধারা আবর্তিত। প্রভাত সূর্যের কিরণে সে আনন্দোচ্ছ্বাস নেচে উঠে; আবার সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তার বুকে অন্ধকারময় বিষণ্ণ এক রহস্যলোক ঘনীভূত হয়ে উঠে। শীতকালে তার সংকীর্ণ, ধীরগতি অথচ সৌন্দর্যময়। বর্ষার সেই জলরাশি গর্জনে মেতে ফুলে উঠে, তখন সে সমুদ্রের মত বিস্তৃত বক্ষ, সমুদ্রের মতই ধ্বংসের অশেষ শক্তি যেন তার করায়ত্ত।